পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

১৫ ই শ্রাবণ, ১৩৮৭ বাংলা ৩১ শে জুলাই ১৯৮০ ইং : ১৮ই রমজান, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ঈদ সংখ্যা ৩১শে জুলাই, ১৯৮০ ইং | ৩৪শ বর্ষ ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "মিথ্যা সাক্ষ্য"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : "কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব" "নাজাত সম্বন্ধে কুরআনী আকীদা"	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* ঈদুল ফিতরের খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৯
* বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—	পবিত্র কুরআন : মোহ্‌তরম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব	১৫
* হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এ সত্যতা (৫২) "আমেরিকার ডুই সম্পর্কিত নিদর্শন"	হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	২১
* জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার সম্পর্কে সমসাময়িক চিন্তাবিদগণের অভিমত :	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৫
* সংবাদ :		২৭
* হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ঈমানবর্ধক সংক্ষিপ্ত বিবরণ :	সংকলনে : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮
* রমজানে পালনীয় কয়েকটি জরুরী বিষয় :	,, ,, ,,	৩২

ঈদ মোবারক

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে পাক্ষিক আহ্‌মদীর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার সমীপে আন্তরিক 'ঈদ মোবারক'।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ছুটিতে প্রেস বন্ধ থাকার দরুণ পাক্ষিক আহ্‌মদীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করা যাইতেছে। ৮ম সংখ্যা ৩০শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশ হইবে, ইনশাআল্লাহ। —সঃ আঃ

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে জুলাই, ১৯৮০ ইং : ৩১ শে ওফা, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

'তফসীরে কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩) এইরূপে হজ্জ রহিয়াছে। এই ইবাদতের উদ্দেশ্য সমূহও রোযার সঙ্গে অনেকটা মিল খায়। এই ইবাদতের মাধ্যমেও ইসলাম মুসলমানকে আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ, স্বজন ও প্রিয়জনের বিচ্ছেদ স্বীকার করার অভ্যাস শিক্ষা দেয় এবং বিশ্বব্যাপী ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব বোধকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে এবং উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করে। ইহা ছাড়া কুরআন করীমে আর একটি হিকমত এই ব্যক্ত হইয়াছিল যে এই ইবাদত দ্বারা আল্লাহতায়ালার স্মৃতি চিহ্ন ও নিদর্শনাবলীর মহিমা ও মহত্ব উপলব্ধি করা হয়, এবং উহার স্মৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বস্তুতঃপক্ষে হজ্জ সেই অপূর্ব ঘটনাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে অরণ্য মরু-ভূমিতে ছাড়িয়া আসার কারণে সংঘটিত হইয়াছিল। তাছাড়া কুরআনে ব্যক্ত হইয়াছে যে খানা-এ-কা'বাই হইতেছে সর্ব প্রথম ঘর যাহা একক খোদার ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে। সুতরাং হজ্জ উপলক্ষে হাজীর চক্ষের সম্মুখে সেই দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে যে কিরূপে আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দাকে যে তাঁহার জন্য কুরবানী ও ত্যাগ স্বীকার করে বিপদ আপদ ও মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন এবং মান-সম্মান দ্বারা বিভূষিত করেন। এইরূপে তাহার অন্তরে খোদার শক্তি ও মহিমা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। সে নিজেকে সেই পূত পবিত্র ঘরে উপস্থিত দেখিয়া যাহা জগতের প্রারম্ভে আল্লাহ্তায়ালার স্মরণের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছিল ঐ সকল লোকের জন্য নিজের অন্তরে পরম শ্রদ্ধা-ভক্তি ও অটুট আধ্যাত্মিক সম্পর্ক অনুভব করে যাহারা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে একই আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিতেছে যাহাতে এই ব্যক্তিও আবদ্ধ আছে, অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার প্রেমের ও স্মরণের বন্ধন যাহা নূতন হউক বা পুরান হউক সকলকেই আবদ্ধ রাখিয়াছে।

মোট কথা, ইসলাম কেবল ইবাদতের আদেশই দেয় নাই বরং সংগে সংগে উহার হিকমত ও তাৎপর্যও ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে এবং উহার অনুসরণকারীগণকে সুন্দরভাবে উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছে যে ইবাদত বস্তুতঃ তাহাদেরই কল্যাণার্থে নির্ধারিত করা হইয়াছে ; খোদাতায়ালা নিজের হিকমত স্বীকার করাইবার জন্য এইরূপ আদেশ দেন নাই। যখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল তখন ধর্মকর্ম পালনকারীর অন্তরে যে উৎসাহ ও আনন্দের সঞ্চার হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ; অবশ্যই স্বচ্ছন্দে সকল আদেশ পালন করিয়া যাইবে।

কুরআন করীম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্মীয় ও স্বর্গীয় কিতাবাদি পড়িলে বুঝা যায় যেন তাহারা শরীয়তকে ঝঞ্জাল ও দায় স্বরূপ পেশ করিয়াছে। বেদকেই ধরা হউক, প্রকৃতপক্ষে বেদ নিবিড় অন্তরালে গুপ্ত হইয়া এমন এক অভেদ্য ভেদে পরিণত হইয়া গিয়াছে যাহার ভেদ পাওয়া লোকের জন্য কেবল কঠিনই নয় বরং বেদনাজনক বিষয় হইয়া গিয়াছে। ইহা যে কোন শরীয়তের কিতাব, ইহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। তওরাত এবং যিন্দাভেস্তা পড়িলে অবশ্য ইহা বুঝা যায় যে ইহাতে শরীয়ত রহিয়াছে কিন্তু ইহাও স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, শরীয়ত এজন্য প্রদান করা হয় নাই যে, ইহাতে মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিহিত আছে বরং এই জন্য প্রদান করা হইয়াছে যে খোদা এরূপ চাহিয়াছেন। সুতরাং শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য, যথা অভ্যন্তরীণ সংশোধন ও আত্মশুদ্ধি পূর্ণ হইল না। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ইহাতে কোন কোন আদেশ এমনও রহিয়াছে যাহা মানুষের জন্য অবশ্য কল্যাণজনক কিন্তু ঘটনাক্রমে এক আধটি এমন আদেশ বিদ্যমান থাকা কোন বৈশিষ্ট্যের কারণ হইতে পারে না। কুরআন এমন এক কিতাব যাহার প্রত্যেকটি আদেশই হইতেছে মানব জাতির জন্য জ্ঞানগর্ভ এবং কল্যাণজনক।

দ্বিতীয় বিষয় যাহা পালন করিলে উৎসাহ এবং আনন্দের সঞ্চার হয় তাহা হইতেছে এই যে, যে শিক্ষার উপর মানুষ আমল করিবে উহাতে রহমতের দিকটা প্রবলতম থাকিতে হইবে, কারণ রহমতের দিকটা প্রবলতম হইলে সাধনাকারীর এই উপকার হইবে যে, আমলের ক্ষেত্রে তাহার দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হইয়া থাকিলে রহমতের দিক উহা পূর্ণ করিয়া দিবে। এই বৈশিষ্ট্য কেবল ইসলামের মাধ্যমেই পাওয়া যায়, বাকি সকল ধর্মই এই বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত।

যেমন হিন্দুগণ জন্মান্তর্বাদে বিশ্বাসী। জন্মান্তর্বাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, আল্লাহতায়ালা কোন মানুষের ক্ষমা করিতে পারেন না এবং তিনি কাহাকেও পুণ্য কাজের বিনিময়ে তাহার পাপ কাজের অতিরিক্ত দিতে পারেন না। জন্মান্তর্বাদের উপর বিশ্বাসীগণ এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে যে পাপী লোকদিগকে চৌরাশিবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এবং পাপী মানুষকে মানুষের আকারের পরিবর্তে (আমল অনুযায়ী) বিভিন্ন জীব জন্তুর ও পশুর আকার ধারণ করিতে হয় এবং নিজের পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করার কারণ হইতেছে এই যে তাহাদের দৃষ্টিতে আমলের প্রতিফলন ও প্রতিদানে ঈশ্বরের রহমের কোন দখল নাই। বেদ দর্শনের উপর চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে কোন মানুষের পক্ষেই মুক্তি লাভ আদৌ সম্ভবপর নহে ; কেননা বেদগুলি না পড়িয়া ও না শিখিয়া কোন ব্যক্তির পক্ষে সঠিক ভাবে সৎ ও অসৎ কর্মের জ্ঞান অর্জন সম্ভব নহে ; আর জ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তি মন্দ কর্ম হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। কিন্তু বেদগুলি পড়ার

জন্য বয়ঃপ্রাপ্তির (সাবালক হওয়ার) বয়সের পর কমপক্ষে ৩৬ (ছয়ত্রিশ) বৎসর সুদীর্ঘকাল নির্ধারিত করা হইয়াছে যেমন আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দেয়ানন্দ সাহেব স্বীয় পুস্তক 'সাতিয়ারথ প্রকাশে' উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :

"অষ্টম বৎসরের পর ছয়ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ এক একটি বেদ ও উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পড়ার জন্য দ্বাদশ দ্বাদশ বৎসর করিয়া মোট ছয়ত্রিশ বৎসর এবং আষ্ট বৎসর সংযোগে মোট চুয়াল্লিশ, আঠার বৎসরের ব্রহ্মচারীই হউক না কেন এবং পূর্বের অষ্ট সংযোগ করিয়া ছাব্বিশ অথবা নয় বৎসর অথবা যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার্জন পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মচারীই থাকিবে (৮৯ পৃঃ) ।"

এই শিক্ষাকালে বেদ অধ্যয়নকারীর দ্বারা যে পাপ অর্জন হইবে সেই পাপ কি ক্ষমা করা হইবে এবং ঈশ্বর স্বীয় ভক্তদের পাপ কি ক্ষমা করিয়া থাকেন ? ইহার উত্তর 'সাতিয়ারথ প্রকাশ'-এর লেখক পণ্ডিত দেয়ানন্দ যাহা দিয়াছেন উহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

"প্রশ্ন, ঈশ্বর তাহার ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন, না কি ?

উত্তর, না, কারণ পাপ ক্ষমা করিলে ন্যায়বিচার ক্ষুণ্ণ হইবে এবং সকল মানবই পাপী হইয়া যাইবে কারণ ক্ষমার কথা শুনা মাত্রই মানুষ কোন রকমের ভয়, সংকোচ ও দ্বিধা না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পাপকর্ম করিতে সাহস পাইবে। যেমন কোন রাজা পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিতে চলিয়া যায় তাহা হইলে প্রজাগণ আরও দুঃসাহসে মাতিয়া উঠিবে এবং পূর্বাপেক্ষা বড় বড় অপরাধ করিতে আরম্ভ করিবে। এইজন্য যে রাজা ক্ষমা করিয়া দিবে। তাহারা পূর্ণরূপে আস্তাবান হইবে যে রাজার সম্মুখে হাত জুড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই অপরাধ ক্ষমা হইয়া যাইবে। ফলতঃ যাহারা অপরাধ করে না তাহারাও শাস্তি সম্বন্ধে নির্ভয়ে পাপাচারে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। অতএব ঈশ্বরের দায়িত্ব হইল কর্মের প্রতিফল দান করা, ক্ষমা করা নয়।" (৭ম অধ্যায়)

ইহাতে বুঝা গেল যে ঈশ্বর স্বীয় ভক্তদের পাপও ক্ষমা করিতে পারেন না। এখন চিন্তা করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া যায় যে মানুষের জন্য মুক্তি লাভের কোন পথই বাকি থাকে না ; কারণ মানুষ দ্বারা পাপ সংঘটিত হওয়া বিশেষ ভাবে যখন সে বেদের অধ্যয়ন করিতে থাকে এবং এখনও বেদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করিতে পারে নাই, অবশ্যই সম্ভাব্য। মানুষ যখন (স্বীয় কর্মফলে) কোন পশুর আকার ধারণ করে তখন তাহার মধ্যে মানবতার অনুভূতি মোটেই থাকে না। যখন নূতন ভাবে সে মানুষের আকার ধারণ করিবে তখন পুনরায় কোন না কোন ত্রুটির ফলে পশুর আকার ধারণ করিবে, এই ভাবেই এই প্রবাহ ও চক্রকার সদা বলবৎ থাকিবে, কোন মুহূর্তেই মুক্তি লাভ সম্ভব হইবে না।

হিন্দু ধর্ম মতে যদি কোন ব্যক্তির কচিৎ মুক্তি লাভও করিয়া ফেলে, তথাপি তাহার মুক্তি চিরমুক্তি হইবে না বরং কিছুকাল পরে তাহাকে সেই মুক্তি-ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে এবং জগতে পুনর্জন্মবাদের চক্করে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে ঈশ্বর মুক্ত প্রাপ্ত আত্মার কোন পাপ গোপন করিয়া রাখিয়া দেন কারণ হিন্দু ধর্মে পাপ মার্জনার কোন অবকাশ নাই। এইরূপে কোন পুণ্য কর্মের প্রতিদান অতিরিক্ত মাত্রায় অথবা অনন্তকালব্যাপী প্রদান করা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী।

হাদিস শরীফ

মিথ্যা সাক্ষ্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫১৬। হযরত আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যে ব্যক্তি জুলুমের দ্বারা কোনো মুসলমানের 'হক' মারে, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য দোযখের আগুন নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং জান্নাত তাহার জন্য হারাম করেন।" ইহাতে এক ব্যক্তি নিবেদন করিল : 'যদি তাহা সামান্য জিনিষ হয়, তবু কি?' তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "হ্যাঁ, যদিও উহা 'পিলু' (এক প্রকার বন্য কাঁটাযুক্ত) গাছের একটা শাখা হউক না কেন?"

['মুসলিম ; কিতাবুল ঈমান, 'বাবু ওয়ীহু মানেকতাতায়া হাক্কাল মুসলিমে ১:৫৬ পৃঃ]

ইহসান জেতানো

৫১৭। হযরত আবু যার' রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "তিন ব্যক্তির সঙ্গে কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা কথা কহিবেন না। তাহাদের চিত্ত শুদ্ধিও করিবেন না, বরং তাহাদিগকে ভয়ানক আযাব দিবেন।" হুজুর (সাঃ) এই কথাগুলি তিন বার ফরমাইলেন। ইহাতে হযরত আবু যার' (রাযিঃ) নিবেদন করিলেন : "তবে, ইহারা ভীষণ আকৃতি বিশিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত। হুজুর, ইহারা কে?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "সে যে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কাপড় ছেঁচড়াইয়া চলে, কথায় কথায় ইহাসন জেতায় এবং মিথ্যা কসম খাইয়া তাহার সোদা (পণ্য) বিক্রী করে।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১ : ৪৬)

কামলুলোপ দৃষ্টি, বিপথগামিতা, বিবাহপযোগী 'না-মুহরম' স্ত্রীলোকের সহিত নির্জন বাস

৫১৮। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাজিয়াল্লাহু বলেন, যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমাইলেন : "পথে বসা হইতে বাঁচিয়া থাকিবে।" লোকে বলিল : রাসুলুল্লাহ (সাঃ), আমরা এই সব স্থানে বসিতে বাধ্য। সেখানে বসিয়া আমরা কথা-বার্তা বলি ; পরস্পর পরামর্শাদি করিয়া থাকি।" ইহাতে হুজুর (সাঃ) ফরমাইলেন : "যদি তোমাদের বসিতেই হয়, তবে 'পথের হক' পথকে দিবে।" সাহাবাগণ (রাযিঃ) নিবেদন করিল : 'পথের হক কি'? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : দৃষ্টি নীচ দিকে রাখা ও কাহাকেও দুঃখ-কষ্ট না দেওয়া, সালামের উত্তর দেওয়া, ভাল কথা শিক্ষা দেওয়া এবং কুকথা ও কুকর্ম হইতে রোধ করা।" ('মুসলিম', কিতাবুস সালাম ২ : ৩ পৃঃ)

৫ ৯। হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) ফরমাইয়াছেন : "মুজাহেদ তথা ধর্ম যোদ্ধাগণের স্ত্রীদের সম্মান করা এবং তাহাদের আবরুর প্রতি তেমনি দৃষ্টি রাখা যেমন স্বীয় মাতার সম্মান ও আবরুর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। আর যে দৃষ্টি রাখার আড়ালে মুজাহেদ ভ্রাতার বিবির প্রতি কুনজর করে এবং খেয়ানত বা বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ করে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে এরূপে দাঁড়াইবে যে, মুজাহেদ তাহার ইচ্ছামত উহার সব পূণ্য (নেকী) লইয়া যাইবে এবং এই বদকার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া আঁ-হযরত (সাঃ) আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফরমাইলেন : তোমাদের ধারণা কি? এই দুর্ভাগা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও দুর্গতি হওয়ারই ছিল না কি?" (মুসলিম, 'কিতাবুল্-এমারাহ্ ১-২ : ২২৬ পৃঃ) (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

– এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

পবিত্র রমজানের ফজিলত

(১) "রমজান এরূপ বরকতপূর্ণ মাস যে উহার শুরুতে (তথা প্রথম দশকে) রহমত, উহার মধ্যভাগে (তথা দ্বিতীয় দশকে) মাগফিরাত এবং উহার শেষ ভাগে (তথা তৃতীয় দশকে) অগ্নি হইতে পরিত্রাণ (তথা পূর্ণ শান্তি ও বেহেস্ত লাভ) নির্ধারণ করা হইয়াছে।" (মিশকাত)

(২) 'হে মুসলমানগণ! রমজানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিতে নির্ধারিত 'লাইলাতুল কদর'-এর সন্ধানে চেষ্টিত হও।" (বোখারী)

(৩) "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রিতে ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে নামাজ পড়িবে এবং রমজান মাসে ঈমান ও সাওয়াবের নিয়তে রোজা রাখিবে, তাহার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হইবে।" (বোখারী)

তারাবীহর নামাজ

(১) হযরত উরওয়াহ্ (রাঃ) বলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ আঃ) একবার গভীর রাত্রিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে আসিয়া নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়িলেন; উপস্থিত লোকজনও তাঁহার পিছনে নামাজ পড়িলেন। ভোর হইলে তাঁহারা অন্যান্যদের নিকট উহা উল্লেখ করিলেন। পরবর্তী রাত্রিতে আরও অধিক লোক মসজিদে একত্র হইলেন এবং তাঁহারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর

সহিত নামাজ আদায় করিলেন। সকাল বেলায় তাঁহারা উহা মানুষের মধ্যে আলোচনা করিলে তৃতীয় রাত্রিতে আরও বেশী সংখ্যক লোক মসজিদে সমবেত হইলেন। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সা:) মসজিদে আসিলেন এবং নামাজ পড়িলেন এবং সকলে তাঁহার সহিত নামাজ পড়িল। চতুর্থ রাত্রিতে মানুষের সমাগমে মসজিদ ভরিয়া গেল এবং সকলের উহাতে সংকুলান দুষ্কর হইয়া পড়িল। এমন কি হযরত নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাজে উপস্থিত হইলেন। ফজরের নামাজ আদায়ের পর তিনি মানুষের দিকে মুখ ফিরাইয়া কলেমা শাহাদত পড়িবার পর বলিলেন, "মসজিদে তোমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি বেখবর ছিলাম না কিন্তু আমার ভয় হইল যে, এমনিধারায় এই নামাজ তোমাদের উপর ফরজ হইয়া যায় এবং তোমরা (ইহা বাজামাত আদায়ে) অক্ষম হইয়া পড় (সেই জন্য আজ আর আমি আসিলাম না)। তারপর হযরত নবী করীম (সাঃ) ওফাত পাইলেন এবং উক্ত বিষয় ঐ অবস্থায় থাকিয়া গেল।" (বোখারী)

(২) হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রমজান মাসের এক রাত্রিতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর সহিত মসজিদের দিকে গমন করিলেন। মসজিদে লোকজন বিক্ষিপ্তাবস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে নামাজ পড়িতেছিলেন—কেহ কেহ একাই নামাজ পড়িতেছিল, আবার একজনের পিছনে একদল লোক নামাজ আদায় করিতেছিল। ইহা দেখিয়া (খলিফাতুল মুসলেমীন) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "আমি মনে করিতেছি যে, সকলকে যদি একজন ক্বারীর পিছনে একত্র করা যায়, তাহা হইলে উত্তম হইবে।" তারপর তিনি তাঁহার সেই এরাদা পরিপক্ক (বাস্তবায়িত) করিলেন এবং লোকজনকে উবাই বিন কা'ব (ক্বারী ও হাফেজে কুরআন)-এর পিছনে (নামাজ আদায়ে) একত্র করিলেন। তারপর আবার আমি (বর্ণনাকারী) তাঁহার সহিত মসজিদে গেলাম। তখন মানুষ তাহাদের ক্বারী উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর পিছনে নামাজ পড়িতে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, "যদিও ইহা এক নুতন বিষয়, কিন্তু ইহা উত্তম বিষয়। অবশ্য রাত্রির যে অংশে (তথা শেষ রাত্রিতে) এই সকল লোক ঘুমাইয়া থাকেন উহা রাত্রির সেই অংশের (তথা বাদ এশা) অপেক্ষা শ্রেয় যে অংশে তাহারা নামাজ আদায় করিতেছেন।" তিনি উহা রাত্রির শেষ ভাগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন এবং মানুষ রাত্রির প্রথম ভাগে (তাহাজ্জুদের স্থলে তারাবীহর) নামাজ আদায় করিত।

(৩) হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "হযরত রসুল করীম (সাঃ) রমজান মাসে অথবা অন্য সময়েও তাহাজ্জুদের নামাজ এগারো রাকাতের অধিক পড়িতেন না।... আট রাকাত আদায়ের শেষে তিন রাকাত বেতের পড়িতেন।"

(বুখারী, কিতাবুস-সওমে, বাবু ফায্‌লে মান কামা রামজানা ; মুসলিম পৃঃ ২৮৩)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)এর

অমৃত বানী

'যুক্তি ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মানদণ্ডে কুরআন শরীফের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠতা"

"নাজাত লাভের প্রকৃষ্ট উপাদান একমাত্র পবিত্র কুরআনই মানুষকে দান করিয়াছে।"

"কোন জিনিস যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট ও নির্ধারিত হইয়া থাকে উহা সেই উদ্দেশ্যকে উত্তম ও সর্বাঙ্গীণ রূপে সমাধা করিতে পারিলেই উহার মহত্ব ও পরম গুণ প্রতীয়মান হয়। যেমন, কোন গরু হাল-চাষের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হইলে উহার বিষয়ে দেখিতে হইবে যে উহা হাল-চাষের কাজ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারে কি না। তেমনি ধারায় ইহা স্পষ্ট যে, আসমানী কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই হওয়া উচিত যে, উহা যেন স্বীয় শিক্ষা, তাসির, আধ্যাত্মিক প্রভাব ও সংস্কারমূলক শক্তি এবং রুহানী গুণের দ্বারা স্বীয় অনুগামীদিগকে সকল প্রকারের পাপ ও কলুষিত জীবন হইতে মুক্ত করিয়া পবিত্র জীবনে অভিষিক্ত করে এবং সার্বিক আনন্দের উৎস অতুল্য পরম সত্তা আল্লাহতায়ালার সহিত তাহাদিগের এশ্‌ক ও প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করে। কেননা এই এশ্‌ক ও মহব্বতই হইল নাজাত বা পরিত্রাণের মূল, এবং ইহাই সেই স্বর্গ যাহাতে প্রবেশ করার পর সকল প্রকার অবসাদ, তিক্ততা ও দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটিয়া থাকে। নিঃসন্দেহে এরূপ এলহামী কিতাবই জীবিত ও কামিল কিতাব, যাহা খোদা-অন্বেষী ব্যক্তিকে তাহার মঞ্জিলে-মকসুদে পৌছায় এবং তাহাকে হীন পার্থিব জীবনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ঐ প্রকৃত প্রেমাস্পদের সহিত তাহার মিলন ঘটায়, যাঁহার মিলনই হইল মানবের প্রকৃত নাজাত। তেমনিধারায় উহা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে এরূপ পূর্ণ ও পরিণত মা'রেফত (বা তত্ত্বজ্ঞান) দান করে যেন সে খোদাতায়ালাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এইরূপে উহা খোদার সহিত তাহার এমন দৃঢ় সম্পর্ক কায়েম করে যাহার ফলে সে তাঁহার ওফাদার ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হয় এবং খোদাতায়ালা তাহার প্রতি এত প্রচুর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষণ করেন যে তাঁহার বিবিধ ও বিচিত্র স্বর্গীয় সাহায্য ও সমর্থনের দ্বারা তাহার এবং অপরের মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া দেন এবং তাহার উপর স্বীয় মা'রেফত ও জ্ঞানতত্ত্বের দ্বারসমূহ খুলিয়া দেন। ...

সুতরাং প্রত্যেকের নিকট সুস্পষ্টরূপে আমি ইহা প্রকাশ করিতেছি যে, সেই কিতাব যাহা উক্ত প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ করে তাহা হইল কুরআন শরীফ।"

(চাশমায়ে মা'রেফত পৃঃ ২৯১)

"নাজাত বা পরিত্রাণ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের আলোকে আমাদের আকীদা"

"মূলতঃ 'নাজাত' নির্ভরশীল একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজলের উপর।"

"নাজাত সম্পর্কে যে আকীদা কুরআন শরীফ হইতে প্রতীয়মান হয় তাহা হইল এই যে, শুধু রোজা, নামাজ, যাকাত ও সাদকা-খয়রাত এবং হুকুম পালনে নাজাত পাওয়া যায় না বরং উহা একমাত্র আল্লাহতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, যাহা দোওয়ার দ্বারা হাসিল হয়। সেইজন্যই اهدنا الصراط المستقيم-এর দোওয়া সর্ব প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কেননা যখন এই দোওয়া কবুল হইয়া যায় তখন উহা আল্লাহতায়ালার ফজলকে আকর্ষণ করে, আর উহার ফলেই মানুষের পক্ষে নেক আমল সমূহ উহাদের যাবতীয় শর্ত ও স্বরূপ সহ স্বতঃই প্রতিফলিত হয়।

যদি নাজাতকে শুধু আমলের উপর নির্ভরশীল বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় এবং খোদাতায়ালার ফজল এবং দোওয়াকে কেবল মূল্যহীন ও বৃথা বলিয়া জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে উহা হইবে এক প্রকার সূক্ষ্ম শের্‌ক। কেননা প্রকারান্তরে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মানুষ নিজেই নাজাত লাভে সক্ষম এবং আমল সমূহ তাহার এখতিয়ারভুক্ত, যেগুলি সে নিজেই সম্পাদন করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় নাজাতের চাবিকাঠি মানুষেরই হস্তে সমর্পিত বলিয়া সাব্যস্ত হয়, এবং খোদাতায়ালার সহিত নাজাতের কোনই সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না, যেন তিনি কোন কিছুই নহেন এবং তাঁহার থাকা, আর না থাকা সমান হইয়া দাঁড়ায় (নাউযুবিল্লাহ্‌)। কিন্তু তাহা কখনও হইতে পারে না; আমাদের এরূপ আকীদা নহে। আমাদের আকীদা এই যে, নাজাত তাঁহার ফজলের দ্বারা লাভ হয়, এবং একমাত্র তাঁহারই ফজলের দ্বারা মানুষকে নেক (সালেহ) আমলসমূহ সম্পাদনের তওফিক ও শক্তি দান করা হয়। আর খোদাতায়ালার ফজল দোওয়ার দ্বারা হাসিল হয়, কিন্তু সেই দোওয়ার দ্বারা, যাহা খোদাতায়ালার ফজলকে আহরণ করিতে সক্ষম হয়। সেই দোওয়াও মানুষের নিজের ইখতিয়ার ভুক্ত নয়। দোওয়ার যাবতীয় জরুরী উপাদান লওয়াজেমা ও শর্তাবলী, যেমন– আত্মবিস্মরণ, তন্ময়তা, 'তওক্কল', 'তাবাত্তুল', ভাবাবেশ ও উচ্ছ্বাস ইত্যাদি নিজে নিজেই লাভ করিতে পারা মানুষের সাক্ষাৎ ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত ব্যাপার নয়। বস্তুতঃ যখন ঐ প্রকারের দোওয়ার সুযোগ ও শক্তি তাহাকে দেওয়া হয় তখনই উহা আল্লাহতায়ালার ফজল আকর্ষণ পূর্বক সেই যাবতীয় লওয়াজেম ও শর্তাবলী আহরণ করে, যেগুলি পুণ্য (সালেহ) আমল সমূহের প্রাণ-বস্তু স্বরূপ। নাজাত সম্বন্ধে ইহাই আমাদের আকীদা।" (মলফুজাত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১)

অনুবাদ: মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী,

সব বরকত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে
ওসাল্লাম হইতে। [ইলহাম—হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)]

ঈদুল-ফিতরের খোতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১৩ই জানুয়ারী ১৯৬৭ইং, মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

এই ঈদ খোদাতায়ালার শোকর আদায় করার জন্য উদ্‌যাপন করা হয় এ জন্য যে তিনি আমাদিগকে পবিত্র মাহে রমজানে বিশেষ এবাদত সমূহ পালন করার তওফিক দিয়াছেন।

অভাবীদিগকে অন্ন দানও রমযানের অন্যতম এবাদত এবং ঈদের একটি জরুরী অংশ, যাহা আপনাদের কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্নরূপ আয়াতটি তেলাওত করেন :

فلا اقتحم العقبة ٥ وما ادراك ما العقبة ٥ فك رقبة ٥ او اطعم فى
يوم ذى مسغبة ٥ يتيما ذا مقربة ٥ او مسكينا ذا متربة ٥ (بلد : ١١-١٧)

[অর্থ—"কিন্তু সে তথাপি উচ্চ শিখরে আহরোণ করিল না। তুমি কি করিয়া জানিবে যে এই উচ্চ শিখরে আরোহণ করা কি বস্তু? ইহা হইল গোলামকে স্বাধীন করিয়া দিয়া তাহাকে দাসত্ব মুক্ত করা, অথবা ক্ষুধার সময়ে ও দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্য দান করা এতিম আত্মীয়কে, কিংবা যে মাটিলুণ্ঠিত কাঙ্গালকে।" [(আল-বালাদ-১১-১৬) —অনুবাদক]

অতঃপর হুজুর বলেন :

আজ ঈদের দিন। আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলকে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভের সৌভাগ্য দান করুন।

আমাদের জানা মতে ঈদ উহাকে বলে যাহা বার বার ফিরিয়া আসে এবং যাহা বারবার আনায়নের বাসনা আমাদের অন্তরে জাগে।

এই ঈদ আল্লাহতায়ালার শোকর গুজারী আদায়ের জন্য উদ্‌যাপন করা হয় এজন্য যে তিনি আমাদিগকে পবিত্র মাহে রমজানে বিশেষ এবাদত সমূহ পালনের তওফিক দিয়াছেন। যেমন, 'কেয়ামে লাইল' তথা রাত্রিবেলায় নামাজ আদায়ের ও দিনের বেলায় রোজা রাখার এবং অভাবীদিগকে আহার দানের ; কেননা ইহাও রমজানের এবাদতের এক অতি জরুরী অংশ।

হযরত নবী করীম (সাঃ রমজান মাসকে রহমত, মাগফিরাত এবং 'ইতকুম-মিনান-নার' (আগুণ হইতে পরিত্রাণ)-এর মাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা সেই মাস যে মাসে এরূপ উপাদান সমূহ রাখিয়াছেন যেগুলির দ্বারা তাঁহার বান্দাগণ যদি উপকার

লাভ করে এবং যে সকল সুযোগ ও উপায় উপকরণ তাহার রব এই পবিত্র মাসে সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি সে ঐগুলির সদ্ব্যবহার করে তাহা হইলে উহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ-তায়ালার ফজল ও কৃপাকে সে আহরণ করিতে এমনই সক্ষম হয় যে, সে তাঁহার রহমতের ওয়ারিশ হয়, তাহার রবের মাগফিরাত হইতে অংশ লাভ করে এবং শয়তানের গোলামী হইতে তাহার গ্রীবা মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের আগুন হইতে তাহাকে বাঁচান হয়।

শেষ সিপারার যে আয়াতগুলি আমি পাঠ করিয়াছি, সেগুলিতেও এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা মানুষের জন্য যে উপকরণ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছি যদি সে ঐগুলি উপলব্ধি করিতে পারিত এবং আমাদের নির্দেশিত পন্থায় কাজ করিত তাহা হইলে তাহার জন্য রুহানী উচ্চস্তর সমূহে ক্রমাগত আরোহণ করা সম্ভবপর হইতো। কিন্তু এই যাবতীয় উপকরণ সত্ত্বেও এবং সেই মহান হেদায়াত সত্ত্বেও যাহা কুরআন করীমের দ্বারা মানবজাতির প্রতি নাজেল করা হইয়াছে, সে ঐ দিকে মনোনিবেশ করে নাই فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এবং সেই সকল রুহানী উচ্চতায় আরোহণে চেষ্টিত হয় নাই যে সকল রুহানী উচ্চতার শিখরে পৌঁছার উদ্দেশ্যে তাহার জন্য উপকরণ সমূহ সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তারপর আল্লাতায়ালা বলেন যে, আমরা যখন বলিলাম যে, সে রুহানী উচ্চস্থানগুলিতে আরোহণে সচেষ্ট হইল না, তখন উহা বলার উদ্দেশ্য আমাদের এই ছিল যে, সে নিজেও শয়তানের গোলামী হইতে মুক্ত হইল না এবং যাহাতে তাহার ভাইয়েরা ক্ষুধার দাসত্ব এবং শয়তানের গোলামী হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তজ্জন্যও কোনই চেষ্টা করিল না।

এই আয়াতের এক অর্থ ইহাও করা হইয়াছে যে 'গোলামদিগকে মুক্ত করা।' উক্ত অর্থও নিজ স্থানে যথার্থ বটে কিন্তু فَكُّ رَقَبَةٍ (ঘাড়কে গোলামী হইতে মুক্ত করা) এবং عتق من النار (আগুন হইতে মুক্তি পাওয়া)—উভয় বাক্যদ্বয় সুস্পষ্টতঃ একই বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। যদিও সেই সকল লোক যাহারা অপরের জুলুম ও নিজেদের গাফলতির ফলে গোলাম বা পরাধীন হইয়াছে সেই সব লোকের জন্য স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা অথবা স্বাধীন জীবন যাপনে তাহাদের সাহায্য করা বড়ই সওয়াবের কাজ, কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মজলুম ও দয়ার পাত্র আর এক প্রকার গোলাম ও পরাধীন ব্যক্তি আছে যাহাকে মুক্ত করা ও স্বাধীনতা দেওয়ান আমাদের জন্য অধিকতর সওয়াবের ও রহমতের এবং মাগফিরাতের কারণ। এবং এরূপ ব্যক্তি স্বয়ং তাহার 'নাফস', যখন উহা শয়তানের গোলাম হয় এবং খোদাতায়ালার দেওয়া স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়, —অর্থাৎ সেই স্বাধীনতা হইতে, যাহা খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের দ্বারা হাসিল হয়; সেই স্বাধীনতা হইতে যাহা খোদাতায়ালার রহমতের ছায়ার নীচে হাসিল হইয়া থাকে; সেই স্বাধীনতা হইতে যাহা খোদাতায়ালার মাগফিরাতের দ্বারা হাসিল হয়।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা এখানে বলিয়াছেন যে فَكُّ رَقَبَةٍ-এর উপকরণ তো বিদ্যমান ছিল কিন্তু মানুষ সেইদিকে মনোযোগ দেয় নাই ও দৃষ্টিপাতও করে নাই এবং সেই সকল

উপকরণের দ্বারা ফায়দা হাসিল করে নাই ; ফলতঃ সে দাস বা গোলাম হিসাবেই থাকিয়া যায়। অথচ আমরা মাহে রমজানের এবাদত বিশেষতঃ এজন্যই নির্দিষ্ট করিয়াছিলাম যে সে যদি চেষ্টা করিত, মুজাহেদা ও সধনা করিত এবং আমার পথে কুরবাণী ও ত্যাগ স্বীকার করিত—এরূপে যে, আমার উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্ত থাকিত এবং আমার উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুধার্ত বান্দাদিগকে আহার করাইতো, তাহা হইলে সে তাহার গ্রীবা শয়তানের গোলামী হইতে মুক্ত করাইতে পারিত, সেই সকল শিকল হইতে সে মুক্ত হইতে পারিত যেগুলির উল্লেখ কুরআন করীমে আসিয়াছে ঃ

ذرعها سبعون ذراعا অর্থাৎ "জাহান্নামের কারাগারে রাখা অতীব সুদীর্ঘ শৃঙ্খলসমূহ", কিন্তু সে ঐ সকল উপকরণ ও উপাদান সমূহ বিদ্যমান থাকা সত্বেও নিজের গ্রীবা শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিল না।

তেমনিভাবে আর একটি দায়িত্ব তাহার উপরে ন্যাস্ত করা হইয়াছিল, আর তাহা ছিল এই যে, নিজের ভ্রাতাদিগকে ক্ষুধা এবং শয়তানের গোলামী হইতে মুক্ত করা। কুরআন করীম এই প্রসঙ্গে ক্ষুধা শব্দ ব্যবহার করিয়াছে কিন্তু হযরত নবী করীম (সাঃ) আরোস্পষ্টভাবে খুলিয়া বলিয়াছেন ঃ كاد الفقر ان يكون كفرا অর্থাৎ, ক্ষুধা কখনো কখনো কুফর এবং পথভ্রষ্টতায় পরিণত হয় ; ক্ষুধার পরিণতিতে মানুষ অনেক সময় শয়তানের প্রতারণার ফাঁদে পড়িয়া যায় এবং তাহার রব (প্রতিপালক প্রভু)-কে সে পরিত্যাগ করে, তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, খোদাতায়ালাকে 'রায্‌যাক' (উপজীবিকা দানকারী) জ্ঞান না করিয়া সে শয়তানের নিকট এই শর্তের উপরে নিজের রুহ্ বা আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয় (যেমন, আমাদের প্রচলিত কোন কোন কাহিনীতেও শয়তানের নিকট রুহ্ বিক্রয় করার উল্লেখও আছে যে, সে শয়তানের নিকট তাহার আত্মাকে এই শর্তে বিক্রয় করে) যে, সে তাহাকে পার্থিব ধন-সম্পদ, উপজীবিকা এবং আসবাব-পত্র সরবরাহ করিবে। এবং শয়তান তাহার রুহ্ এজন্য ক্রয় করিয়া লয় যে, সে যেন খোদাকে বলিতে পারে, "হে রব! আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি তোমার বান্দাদিগকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করিব। দেখ, সে তোমার বান্দা ছিল কিন্তু সে তোমার বান্দা আর রহিল না। এবং দেখ, আমি তাহার আত্মাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার উপযুক্ত করিয়াছি কেননা তাহাকে আমি এতই পথভ্রষ্ট, অবাধ্য, অবিশ্বাসী এবং উদ্ধত রূপে পরিণত করিয়াছি যে সে তোমার গজবের পাত্র হইয়া গিয়াছে। অতএব, তোমার কহরের অগ্নিপাত তাহাকে দ্বগ্ধিভূত করিয়া কয়লায় পরিণত করিয়াছে।"

সুতরাং, ক্ষুধা অনেক সময় দুর্বলচিত্তে কুফর সৃষ্টি করে। সেজন্য যদিও আল্লাহতায়ালা আলোচ্য আয়াতে ক্ষুধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু উহাও যেহেতু কুফর উৎপাদনের একটা বড় কারণ, সেজন্য উহা এখানে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন এবং আসল উদ্দেশ্য হইল فك رقبة (দাসকে মুক্ত করা) সংক্রান্ত বিষয়ই। প্রথম বাক্যটির প্রধান লক্ষ্য হইল তাহার নিজের গ্রীবাকে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় বাক্যটিতে প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল তাহার ভ্রাতাদের গ্রীবাকে শয়তানের দাসত্ব হইতে মুক্ত করানো ; সেই দাসত্ব হইতে যাহা

অনেক সময় মানুষকে ক্ষুধার পরিণতি হিসাবে এবং অভাব ও দারিদ্রের তাড়নায় বাধ্য হইয়া কুফরের শিকার হইতে হয়। সেজন্যই হাদিস শরীফে বহুলরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ সব সময়ই অত্যন্ত দানশীল ছিলেন, এতই দানশীল ছিলেন যে, তাঁহার দানশীলতার ঘটনাবলী, যেগুলি প্রকাশ্যে সংঘটিত হইয়াছে (বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালার প্রত্যেক বুজর্গ বান্দা—এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপেক্ষা আর কে-ই বা অধিক বুজর্গ হইতে পারে—কতকগুলি নেকী প্রকাশ্যে করিয়া থাকেন, আর কতকগুলি নেকী এত গোপনে করিয়া থাকেন যে, অন্য কেহও সেগুলি জানিতে পারে না) অতএব যেগুলি আমাদের জানা আছে শুধু সেগুলিই যদি একত্র করা হয় তাহা হইলে ইতিহাস এরূপ দানশীল ব্যক্তির কোন নজীর পেশ করিতে পারে না। ইহা সত্বেও হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, রমজান মাসে তাঁহার দানশীলতা এত বাড়িয়া যাইত যে উহার দৃষ্টান্ত এমনই এক রূপ পরিগ্রহ করিত যেমন খোদাতায়ালার রহমতের শীতল বায়ু অতি প্রবল বেগে চলিতে থাকে।

সুতরাং প্রবল বায়ুর ন্যায় তাঁহার দানশীলতা এই দিন গুলিতে প্রবলরূপে আলোড়িত হইয়া উদ্দীপনার সহিত জগতের সামনে আত্মপ্রকাশ করিত।

সুতরাং অভাবীদিগকে অন্ন দানের সহিত পবিত্র রমজানের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সুতরাং কোন কোন বুজুর্গের উক্তি যেমন আমাদের লিটারেচারে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, যখন রমজান মাস আসিত তখন তাঁহারা বলিতেন যে, 'কুরআন করীম পড়ার এবং অনাথ ও অভাবীদিগকে আহার যোগানোর সময় আসিয়াছে। বস্, আমরা শুধু কুরআন শরীফ পড়িব এবং ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণে চেষ্টিত থাকিব।' সুতরাং ভুক বিদূরীকরণের সহিত রমজানের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

সুতরাং পবিত্র রমজানকে রহমত ও মাগফিরাত এবং গোলামী হইতে পরিত্রাণ লাভের মাস বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গোলামী হইতে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মানুষের স্বীয় আত্মার পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভ করা এবং উহার পর তাহার ভ্রাতাদিগকে শয়তানের গোলামী হইতে মুক্ত করা। আমাদের কোন কোন ভ্রাতা এরূপেও শয়তানের গোলাম হইয়া পড়ে যে, নিজের পেট যখন তাহার ভরে না, নিজেও ভুকা থাকে এবং তাহার ছেলে-মেয়েদেরও ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখিতে পায় তখন সে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, খোদাকে ভুলিয়া যায় এবং ইহাও চিন্তা করে না যে এরূপ দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষা স্বরূপ আসিয়া থাকে, ইহাতে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা উচিত; তাহা না করিয়া বিফল মনরথ হওয়া উচিত নয় এবং খোদাতায়ালার গজব ও ক্রোধকে উত্তেজিত করার পথে তাহার পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ভুক মানুষকে الفقر ان يكون كفرا। ১৪—হাদিস অনুযায়ী কুফরে পর্যবসিত করে এবং উহা গোলামীর রূপ ধারণ করে। ক্ষুধার পরিণতি হিসাবে এই প্রকারের গোলামীও আমরা দেখিতে পাই। উক্ত হাদিসের এক অর্থ ইহাও যে, যখন কোন জাতি ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তখন উহারা অন্য জাতির গোলামীর জোয়াল কাঁধে নেয়। সুতরাং যে সকল জাতি ক্ষুধার্ত জাতিগুলিকে শষ্য সরবরাহ করে এবং যেখানেই অভাব দেখা দেয় সেখানে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে সেই সকল জাতি তাহাদের প্রভুসুলভ প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং রাজনৈতিক চাপ ও কর্তৃত্ব খাটাইয়া থাকে এবং গ্রহীতা জাতিগুলি নিজদিগকে পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া

অনুভব করিতে পারে না। আল্লাহতায়ালা আমাদের জাতিকে ইহা হইতে নিরাপদ রাখুন।

সুতরাং একে তো দোওয়া করা উচিত যেন আল্লাহতায়ালা রহমত বর্ষণ করেন এবং আমাদের দেশে খাদ্যাভাবের সৃষ্টি না হয়। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছেন যে, 'মিসকীন, অনাথ ও অভাবীদিগকে আহার করাও'— উহা আমাদের কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

مسكينا ذا متربة-এর একটি অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি নিজ সাধ্যানুযায়ী অর্থোপার্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইয়াও যখন কিছুই লাভ করিতে পারে নাই তখন সে মেহনত-মজুরীর কাজে নিয়োজিত হইয়াছে, আর এই রূপে সে তাহার গায়ে ধুলা-বালি মাখাইয়াছে, এরূপ ব্যক্তিও ذا متربة (মাটিলুণ্ঠিত)। সুতরাং ذا متربة -এর অর্থ অনুযায়ী সেই ব্যক্তি বুঝায় যাহার ভিক্ষা করার বা মাগিবার প্রবৃত্তি ও স্বভাব নাই।

আবার এরূপ বহু লোকও আপনারা দেখিতে পাইবেন, যাহারা সুপোশ, কিন্তু আসলে তাহারা গরীব ও অভাবগ্রস্ত। মানুষের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া তাহারা জীবন নির্বাহ করে; অন্যের নিকট হইতে মাগিয়া তাহারা কাপড় পড়ে, আহার গ্রহণ করে, কিন্তু তাহারা নিজে কাজ-কর্ম করে না। এরূপ মানসিকতা অত্যন্ত পঙ্কিল ও ঘৃণ্য। ইহা হইতে আত্মরক্ষ জরুরী। আল্লাহতায়ালা জামাতের সকলকে ইহা হইতে বাঁচাইয়া রাখুন।

সুতরাং যে অভাবের মধ্যে আছে সে নিজের সাধ্যমত পূর্ণ প্রচেষ্টা করিবে। যদি অন্য কোন কাজ সে না পায় তাহা হইলে মেহনত-মজুরীই করিবে। পরিশেষে বড়ই সম্মানিত মর্যাদাবান সাহাবীগণ যখন হিজরত করিয়া মদিনায় আসেন, তখন কতক আনসার তাঁহাদিগকে বলেন যে, 'আমাদের নিকট অর্থ ও সম্পদ রহিয়াছে; আসুন, আমরা পরস্পর উহা ভাগ-বন্টন করিয়া লই।' তাঁহারা প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'আপনাদের মাল আমরা চাই না। কাস্তে, কুড়াল ও রশি রহিয়াছে; জঙ্গল হইতে আমরা কাঠ কাটিয়া আনিব এবং সেগুলি বিক্রয় করিয়া জীবন নির্বাহ করিব।'

অতএব, এরূপ বুজর্গ সাহাবী মদিনায় আসার পর ذا متربة (মাটিলুণ্ঠিত) ছিলেন. কেননা (মেহনত-মজুরী করিয়া) তাঁহার গায়ে-কাপড়ে ধুলা মাখিয়াছিলেন।

মোটকথা, একদিকে তো আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, ভিক্ষা হইতে, অন্যের সাহায্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতে বাঁচার সর্বাত্মক চেষ্টা করিবে। ذا متربة হইয়া যাও—অন্য কিছু না পাওয়া গেলে, মেহনত-মজুরী করিয়া লও। কিন্তু অন্যদিকে অপরাপর সকলকে বলিয়াছেন যে তোমাদের এই ভাই এতই গয়রত ওয়ালা (আত্মমর্যাদাভিমানী) যে, তোমাদের নিকট হাত পাতা সে এক মুহূর্তের জন্যও পছন্দ করে না। উপায়ান্তর না পাইয়া সে মজুরী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দেখ তাহার কাপড়, তাকাও তাহার চেহারার দিকে; সে ذا متربة কি না? তাহার ذا متربة হওয়া তাহার গয়রতের পরিচয়; সে ভিক্ষা করাকে লজ্জাকর বলিয়া মনে করে ইহা তাহারই প্রমাণ, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেশের পরিস্থিতি ও তাহার পরিবারের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে—যেমন, তাহার সন্তান বেশী এবং সেই অনুপাতে সে উপার্জন করিতে পারে নাই; সেজন্য তাহার গৃহে ভুক মিদ্যমান দেখা যায়; এখন তোমাদের কর্তব্য, নিজেদের এই ভ্রাতার সাহায্য করা।

কিন্তু আপনারা এ সকল ভাইয়ের সাহায্য ততক্ষণ পর্যন্ত করিতে পারেন না যতক্ষণ না আপনারা নিজেরা সরল জীবন যাপন করেন, বিশেষতঃ খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে।

সুতরাং এখনই সময়, আমরা যেন একে তো তাহ্‌রীকে জদীদের সেই দাবী বা দফাকে পুনরায় জীবনে কার্যকরী করি, উহার পূর্ণ অনুশাসন মানিয়া চলি, যে দাবী বা দফাটি আমরা কিছুটা বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছি ; যাহাতে বলা হইয়াছে যে নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সরলতা অবলম্বন করুন, এবং শুধু নিজেদের জন্য টাকা-পয়সাই নয় বরং নিজেদের ভাইদের জন্য খাদ্যও সঞ্চয় করুন। যখন আপনারা খাদ্যের অপচয় করেন তখন দুইটি জিনেসের অপচয় ঘটে—আপনাদের টাকা-পয়সার এবং আপনাদের ভাইয়ের খাদ্যের। ধরুন, আপনি যদি আধা সের আটার পরিবর্তে ছয় ছটাক আহার করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট দুই ছটাকের মূল্য বাঁচিয়া গেল এবং আপনার ভাইয়ের জন্য দুই ছটাক শস্য বাঁচিয়া গেল।

অতএব, আহার কম করুন, সাদা সিদা আহার করুন, যাহাতে যে সকল লোকের আপনার চাইতে অধিক প্রয়োজন তাহাদের পেট ভরিতে পারে, তাহাদের আহার যোগাইতে পারেন।

আর এই ঈদ সম্বন্ধে স্মরণ রাখা উচিত যে, রমজান মাসে অনাথ ও অভাবীদিগকে অন্ন দান অপেক্ষা কতক অন্যান্য এবাদতের দিকে আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করান হইয়াছিল —যেমন, 'কেয়ামে-লাইল' (রাত্রবেলায় নামাজ আদায়)-এর দিকে, এবং খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে (দিনের বেলায়) আহার পরিবর্জনের দিকে। অন্যকে আহার করানো সম্পর্কিত যে বিষয়টি ছিল উহা এত স্পষ্ট ও প্রকাশমান ছিলনা, যদিও রমজানের প্রথম দিন হইতেই হযরত নবী করীম (সাঃ) এবং তাঁহার সাহাবীগণ এবং এই উম্মতের বুজর্গানের চিরাচরিত কর্মধারা এই ছিল যে তাঁহারা বিপুলভাবে অভাবীদিগকে খাওয়াইবার ব্যাপারে যত্নবান হইতেন, কিন্তু রমজান মাসে যে সকল জিনিস বাহ্যতঃ বেশী গুরুত্ববহ ও স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহ হইল 'কেয়ামে-লাইল' এবং খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে আহার পরিত্যাগ করা এবং যে সকল জিনিস ঈদের দিনে অধিকতর স্পষ্ট ও গুরুত্ব বহণ করে সেগুলি হইল নিজেও খাওয়া এবং অন্যকেও খাওয়ান। সুতরাং ইহা প্রকৃতপক্ষে রমজানের এবাদতেরই অংশ বিশেষ এবং সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

আজ ঈদ। আমি আমার খোৎবার শুরুতে এই দোওয়া করিয়াছিলাম যে, আল্লাহতায়ালা এই অধম সহ আপনাদের সকলকে ঈদের প্রকৃত আনন্দ লাভের সৌভাগ্য দান করুন ; তারপর আমি যে মজমুন বর্ণনা করিয়াছি ইহার পর আমি বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদিগকে এই তওফিক ও সামর্থ দিন যে, তাঁহার রহমতের দুয়ার সমূহ আমাদের উপরে যে বার বার খোলা হয় আমরা যেন সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা বার বার ফায়দা হাসিল করিতে পারি এবং প্রতিটি দিনই যেন আমাদের জন্য ঈদের দিনে পরিণত হয় ; আল্লাহতায়ালা যে আমাদের নিকট ইহা চাহিয়াছেন যে, তাঁহার নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের ভ্রাতাদের ক্ষুধা ও অভাবের দিকে আমরা যেন দৃষ্টি রাখি এবং তাহাদিগকে শয়তানের গোলামী হইতে বাঁচাইবার জন্য সচেষ্ট হই—আল্লাহ যেন আমাদিগকে আমাদের সেই দায়িত্ব পালনেরও তওফিক ও সামর্থ দান করেন, এবং এমনি ধারায় উল্লেখিত উভয় অর্থে আমাদের জন্য প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত ঈদের উপকরণ সৃষ্টি হয়। আল্লাহুম্মা, আমীন।

('আল-ফজল' ; ১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৭ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

বাইবেল-প্রতিশ্রুত নূতন নিয়ম—
পবিত্র কুরআন *

ذالك الكتاب

"সেই পূর্ণ কেতাব" (সূরা বাকারাহ-১ম রুকু)

আমরা মূল বক্তব্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে বিষয়বস্তুকে প্রাঞ্জল করিবার জন্য খ্রীষ্টান ভ্রাতাদের কতিপয় বিশ্বাসের উপর আলোকপাত করিব।

"রাব্বুল আলামিন ও আশরাফুল মাখলুকাত"

ইসলাম-ধর্ম অনুযায়ী মানব "আশরাফুল মাখলুকাত"। ইদানীং খৃষ্টানদের পক্ষ হইতেও খবরের কাগজে প্রচার করা হইয়াছে যে, মানব "আশরাফুল মাখলুকাত" অর্থাৎ খোদা-তায়ালার সৃষ্টির মধ্যে সেরা। অথচ পরবর্তী নিঃশ্বাসে বলা হইয়াছে যে, মানব জাতির আদি পিতা প্রথম মানব আদম (আঃ) আল্লাহতায়ালার নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়া পাপী হন। এবং উহার ফলে সারা মানবকুল ওয়ারিশানুক্রমে জন্মগতভাবে পাপী হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে প্রশ্ন জাগে যে, যে ছাঁচে সারা মানব জাতি কালিমা লিপ্ত হইয়াছে, উহা কি উত্তম ছাঁচ? ইহাই কি সেরা সৃষ্টির নমুনা? অথচ সৃষ্টির বাকী সকল কিছুই নিয়মানুগ; এমতাবস্থায় কি মানবকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বলা যাইবে অথবা আমরা তাহাকে 'আরযালুল মাখলুকাত' অর্থাৎ নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলিব!!

বাইবেলের আদিপুস্তক ১:২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মানুষকে খোদা নিজ প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, খোদাও কি তবে পাপী? (নাউযুবিল্লাহ্)। কেননা সরল যুক্তিতে যাহার প্রতিকৃতি পাপী সে নিজেও নিশ্চয় পাপী। আশ্চর্যের কথা, বাইবেলে কিন্তু খোদা আদমকে কোথাও পাপী বলেন নাই। তবে খ্রীষ্টান ধর্মের পক্ষ হইতে একথা প্রচার করা হইল কিরূপে? কোরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি আদমের মধ্যে অবাধ্যতার কোন সংকল্প পান নাই অর্থাৎ তিনি নিঃপাপ ছিলেন। (সূরা তাহা ১১৬ আয়াত) এবং মানবের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাহাকে সর্বোত্তম ছাঁচে সৃষ্টি করা হইয়াছে। (সূরা তীন ৫ আয়াত) এবং তাহার প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে না (সূরা রুম ৩১ আয়াত)। কার্যতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মহাপাপীও নিজেকে সংশোধন করিয়া মহা পূণ্যবান ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ইহা এই জন্যই সম্ভব হয় যে, মানবের প্রকৃতি পবিত্র এবং কর্মের সংশোধনে সে স্বীয় প্রকৃতিগত শুদ্ধতাকে ফিরিয়া পায়। এমতাবস্থায় আমরা কি বলিব? মানব জন্মগতভাবে পাপী অথবা পবিত্র? এই দুই এর কোন্‌টি প্রমাণসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য?

---

* ১৩ই জুলাই, ১৯৮০ ইং তারিখে দৈনিক বাংলার রবিবারের বিশেষ সংখ্যায় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার পক্ষ হইতে প্রচার পত্র হিসাবে প্রকাশিত প্রবন্ধ। রচনা করিয়াছেন মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাঃ আঃ আঃ। —সঃ

"ওয়ারিশী পাপ ও উহার প্রায়শ্চিত্ত"

খ্রীষ্টান ভাইগণ বলেন, জন্মগত ও ওয়ারিশী পাপ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় প্রায়শ্চিত্তকল্পে ক্রুশে যীশুর অভিশপ্ত মৃত্যুতে বিশ্বাস। ওয়ারিশী পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য যদি অভিশপ্ত কুরবাণী ও উহাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে আদমের তথাকথিত পাপানুষ্ঠানের পরে পরেই উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ ছিল। মানুষ রোগাক্রান্ত হইলেই উহার আশু চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টিকর্তা তাঁহার সেরা সৃষ্টিকে আদম হইতে যীশুর ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত চার হাজার বৎসর অবহেলা করিয়া চিকিৎসাহীন অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলেন এবং অগণিত মানুষকে অপমৃত্যুতে মরিতে দিলেন, ইহা কি ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত কথা? এই সুদীর্ঘকালের মানবকুলের পাপ মুক্তির ও উদ্ধারের জন্য খোদা-তায়ালা কি উপায় করিয়াছিলেন? ক্রুশে যীশুর অভিশপ্ত মৃত্যুতে বিশ্বাস যদি ওয়ারিশী পাপ ও উহার প্রবণতা হইতে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে সারা খ্রীষ্টান জগৎ কি এই বিশ্বাসের কল্যাণে পাপমুক্ত ও পুণ্যবান হইয়া গিয়াছে? কার্যতঃ দেখা যায় তাহা হয় নাই।

প্রায়শ্চিত্তবাদে বিশ্বাস যদি পাপের প্রবণতা হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে না পারে, তাহা হইলে এই বিশ্বাসেরই বা প্রয়োজন কি আছে? যীশু যদি কেবল ওয়ারিশী পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে মানবের অর্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কোথায়? যীশু বলিয়াছেন, "গাছ তাহার ফল দ্বারা পরিচিত হয়" (মথি-১২:৩৩)।

সুতরাং যীশুর প্রায়শ্চিত্তবাদের উপর ঈমান আনার কোন ফল নাই দেখিয়া যাহারা তাহাকে মানিবে না তাহাদের পরিণাম কি হইবে? জাহান্নাম? কেন এবং কোন্ অপরাধে? মানবকুলের জন্মগত পাপ খণ্ডনের জন্য যদি যীশুর অভিশপ্ত কুরবাণী হওয়ার প্রয়োজন ছিল, তাহা হইলে সৃষ্টির পদ্ধতিতে খোদাও পাপী সাব্যস্ত হওয়ায় (নাউযুবিল্লাহ) তাঁহার জন্য কে অভিশপ্ত কুরবাণী হইবে? প্রকৃত কথা এই যে, খোদা পাপী নহেন এবং মানব-কুলও জন্মগতভাবে পাপী নহে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন "সুবহানাল্লাহ" (সুরা আল মোমেনুন ৯২ আয়াত) অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা পবিত্র এবং সকল প্রকার পূর্ণ প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। মানবের বিপথগামীতা সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে যে, যখনই মানব সমাজের অধিকাংশ লোকের মধ্যে গ্লানি দেখা দেয়, তখনই আল্লাহতায়ালা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী ও পথ প্রদর্শনকারী হিসাবে নবী প্রেরণ করেন (সাফ্‌ফাত ৭২-৭৩ আয়াত), যেন তাহারা খোদার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিতে না পারে যে, তিনি তাহাদের সংশোধনের কোন ব্যবস্থা করেন নাই (সুরা মায়েদা ২০ আয়াত)। আল্লাহতায়ালা নবী প্রেরণের ব্যবস্থা দ্বারা আদম হইতে আরম্ভ করিয়া সদা মানবকুলকে গ্লানিমুক্ত ও শুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। মানবের স্বকীয় কর্মের গ্লানি দূর করার জন্য কোন্ ব্যবস্থা কার্যকরী প্রমাণিত হইয়াছে ও সত্য সাব্যস্ত হইয়াছে? প্রায়শ্চিত্তবাদের ব্যবস্থা অথবা নবী প্রেরণের ব্যবস্থা?

"প্রায়শ্চিত্তবাদ ও যীশুর দ্বাদশ শিষ্য"

বাইবেল পাঠে দেখা যায় যে, যীশুর নিযুক্ত মাত্র বার জন শিষ্য ছিলেন (মথি ১০:১৪) এবং তাহারা যীশুর অভিশপ্ত কুরবানীর পূর্বেই তাঁহার হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই দীক্ষা গ্রহণে ঈমানের সূত্র কি ছিল? নিশ্চয়ই আদি পাপ খণ্ডনে যীশুর অভিশপ্ত কুরবাণীতে বিশ্বাস নহে? কারণ ইহার অনেক পরে যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হন। খৃষ্টানদের আকিদা অনুযায়ী যীশুর মহামিশন ছিল মানবের ওয়ারিশী পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রুশে তাঁহার অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যীশুর ক্রুশে কুরবাণী হওয়ার পর আমরা তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যদের নিকট গোপনে অথবা প্রকাশ্যে, লোক সমাজে বা ইহুদীদের মধ্যে, যাহাদের মধ্যে তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন, কাহারও নিকট প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ প্রচার করিতে ও তদনুযায়ী কাহাকেও দীক্ষা দিতে দেখিনা। অথচ মহামিশন পূর্ণ করার পরই তাঁহার প্রকৃত কার্য আরম্ভ হওয়া উচিৎ ছিল এবং ইহার পর তাঁহার উচিৎ ছিল নির্ভীক ও উৎফুল্ল চিত্তে এবং প্রেমাকুল কণ্ঠে জগতবাসীকে বিনা কড়িতে বিনা কর্মে ও বিনা শ্রমে শুধু প্রায়শ্চিত্তবাদের উপর বিশ্বাসের কল্যাণেই মহামুক্তি লাভের জন্য আহ্বান করা। কুরবানী গ্রহণকারী খোদারও উচিৎ ছিল এই কার্য সম্পাদানের জন্য যীশুকে যথেষ্ট সময়, সুযোগ এবং যোগ্য সহযোগী দেওয়া। কিন্তু এ সবের কিছুই দেখা যায় না। যাহাদের ওয়ারিশী পাপমুক্তির ব্যবস্থা হইল, তাহারা এ বিষয়ে যীশুর মুখ নিঃসৃত উদাত্ত অমীয়বাণী শুনিতে পাইল না। বরং সকল যুক্তি এবং উচিৎ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিপরীত আমরা যীশুকে ক্রুশের ঘটনার পর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কুহেলিকা আচ্ছন্ন অবস্থায় দেখিতে পাই। সদাই যেন তাঁহার রাখ-ঢাক গোপন করার ভাব। তথাকথিত তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহাকে ভীত, সন্ত্রস্ত, ছদ্মবেশী পলাতকের ন্যায় দেখি। তাঁহার অবস্থা এমন পরিবর্তিত হইয়াছিল যে, তাঁহার শিষ্যগণও চিনিতে পারিতেছিলেন না যে, তিনি কি জীবিত যীশু অথবা মরিবার পর ভুত হইয়া আসিয়াছিলেন।

সদ্য কুরবানী হইয়া গ্যালিলীতে পৌঁছিয়া যখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণের সহিত মিলন মজলিসে তাঁহাদিগকে তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে দেখিলেন তখন কি তাহাদিগকে তাঁহার সুসংবাদ দেওয়া উচিৎ ছিল না যে, তিনি তাহাদের ওয়ারিশী পাপের খণ্ডন করিয়া আসিয়াছেন? তাঁহার ইহা না বলিবার কি কারণ ছিল? তৎপরিবর্তে দেখা যায়, তিনি মাছ ও মধু খাইয়া, তিনি যে মরেন নাই বরং বাস্তবে জীবিত আছেন, ইহা প্রমাণ করিতে চাহিলেন। ইহাতে বিফল হইয়া তিনি বিরক্তচিত্তে মনের দুঃখে তাঁহার মিশন নিজের মনেই চাপিয়া রাখিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন! বিরক্তচিত্তে স্বর্গে গমন বড়ই বিচিত্র কথা। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, যীশু ক্রুশে আদৌ মরিতে চাহেন নাই। (মথি ২৬:৩৮-৩৯) এবং তিনি ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যু গ্রহণের ঘটনার পূর্বরাত্রে খোদার নিকট আপত্তিও জানান। তিনি

খোদাতায়ালার নিকট নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমা হইতে এই পান পাত্র (অর্থাৎ ক্রুশে মৃত্যু) দূর কর" (লুক ২২:৪২)। এই দোয়ার পর "তিনি মর্মভেদী দুঃখে মগ্ন হইয়া আরও একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিলেন", "আরও তাহার ঘর্ম যেন রক্তের ঘনীভূত বড় বড় ফোটা হইয়া ভূমিতে পড়িতে লাগিল" (লুক ২২:৪৪)।

আমাদের তথাকথিত ওয়ারিশী পাপের জন্য খোদা যে যীশুকে কোরবানী করিতেছেন, বাইবেলে এই কথা কোথাও নাই। যীশুর উচিত ছিল ক্রুশ কাষ্ঠে চাপিবার সময় জগৎবাসীর নিকট সগৌরবে ঘোষণা করা যে, তিনি নবীকুলের ওয়ারিশী পাপের জন্য কুরবানী হইতেছেন। তৎপরিবর্তে দেখা যায় তিনি মরণ নিকটবর্তী দেখিয়া আল্লাহতায়ালার নিকট উল্টা নিবেদন করেন যে, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?' (মথি ২৭ : ৪৬)

সবই বিচিত্র ব্যাপার। যীশুর যাহারা সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং যাহাদের সহিত ক্রুশের ঘটনার পর পরই তিনি মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও যীশুর মুখে প্রায়শ্চিত্তবাদের তাজা সুসমাচার শুনিলেন না। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত গ্রহীতা, প্রায়শ্চিত্তের সুসমাচার ও উহার সাক্ষাৎ শ্রোতা এঁরা সব কোথায়? শুন্যে দেখি শুধু পবিত্রাণের বাণী দোদুল্যমান। খ্রীষ্টান প্রচারকগণ এই সমস্ত আজগুবি কথা-মালা কোথায় পাইলেন? আজ আমাদিগকে কাহার কণ্ঠের সুসমাচারের প্রতিধ্বনি শুনানো হইতেছে? নিশ্চয় যীশুর কণ্ঠের নহে।

"প্রায়শ্চিত্তবাদ ও নাস্তিকতাবাদ"

প্রায়শ্চিত্তবাদ ও নাস্তিকতাবাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? নাস্তিকগণ ধর্ম, খোদা, পাপ-পুণ্যের নীতি এবং পরকালকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় দিয়া প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী কার্য করিয়া যায়। যীশুর অভিশপ্ত কুরবাণীতে বিশ্বাস রাখিয়া নিশ্চিত মুক্তি ও কল্যাণ লাভের আশায় একজন খ্রীষ্টানও একইভাবে প্রয়োজন ও সুযোগ অনুযায়ী সব কিছু করিয়া যায়। সুতরাং কার্যতঃ উভয় মতবাদই এক পর্যায়ের। তবে কেন অযথা পবিত্রাত্মা যীশুকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া অভিশপ্ত কর? নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত কার্যপদ্ধতি ছাড়া শুধু মৌখিক ঈমানে মুক্তি লাভ করা বড়ই বিচিত্র কথা। যে বিশ্বাস মানবকে পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারে না, উহা পাপের ফল তথা শাস্তি হইতে তাহাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? সত্যকার ঈমান কৃত অপরাধের জন্য মানবহৃদয়ে অনুতাপের সৃষ্টি করে এবং অনুতাপনলে পাপের বিষ নষ্ট করিয়া মানবকে সৎকর্মে প্রেরণা দেয় এবং তাহার জীবনে এক পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে (সুরা ফুরকান ৭১-৭২ আয়াত)। ইহা ইসলামের শিক্ষা এবং ইহা ফলপ্রসুভাবে প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি কি প্রায়শ্চিত্তবাদের উপর ফাঁকা ঈমান আনার ফলে প্রকাশিত হয়?

"যীশু ও তাহার কেরামতি"

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকগণ বলিয়াছেন, যীশু তাঁহার হস্তের স্পর্শে এক অন্ধকে দৃষ্টি দান করেন, এক বোবাকে বাকশক্তি দেন, এক কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে রোগমুক্ত করেন, এক পক্ষাঘাতগ্রস্তকে ও এক খঞ্জকে চলৎশক্তি দেন এবং এক মৃতকে জীবিত করেন। (মথি ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু

তাহারা ইহা জানান নাই যে, এই লোকগুলি যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন কি না? তাহারা কে এবং তাহাদের পরিচয় কি? অসংখ্য লোক যাহারা এইসব আজগুবি ঘটনা দেখিয়াছিল ও এসবের কথা শুনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কি যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল? কেরামতি দ্বারা উপকৃত ব্যক্তিগণ এবং উহার দর্শকগণের মধ্যে একজনও যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল না, ইহা কিরূপ কথা? ইহা তাজ্জবের ব্যাপার যে, রোগমুক্ত ব্যক্তিগণ যীশুর নিকট কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া তাহারা আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে আপন আপন পথে চলিয়া গেল এবং দর্শকগণ শুধু আশ্চার্য হইয়া ঘটনাগুলি দেখিল। আসলে যদি এত কেরামতি যীশু সত্য সত্য বাস্তবে দেখাইয়া থাকিতেন তাহা হইলে ইহুদীরা তাঁহাকে ক্রুশে দিল কেন? এবং তাঁহার কেরামতি শক্তিতে ভীত না হইয়া তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়ার চক্রান্ত করিতে সাহসই বা করিল কি প্রকারে? এতলোক যাহারা তাঁহার কেরামতি দেখিল, তাহারা কেহ তাঁহাকে বাঁচাইতে বা পক্ষ অবলম্বন করিয়া ক্রুশে দেওয়ার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে আসিল না। পক্ষান্তরে তাহার এক শিষ্য তাঁহাকে রোমক সিপাহীর হস্তে ধরাইয়া দিল (মথি-২৬ঃ ৪৯ -৫১) এবং একজন তাঁহাকে তিনবার অস্বীকার করিল (মথিঃ ২৬ঃ৬৯-৭৪)। তিনি নিজেও ক্রুশ হইতে অক্ষত দেহে বাঁচিবার জন্য কোন বড় রকম কেরামতি দেখাইলেন না। এ সবই কি বিচিত্র ব্যাপার নহে? যাহারা যীশুর এত কেরামতি দেখিয়া এবং উহার দ্বারা উপকৃত হইয়াও যীশুর হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করিল না, তাহাদের কিস্‌সা জগতকে শুনাইয়া লাভ কি? যীশু ক্রুশে অভিশপ্ত কুরবাণী হওয়ার পূর্বে এইসব লীলা দেখাইয়াছিলেন! অথচ বলা হইয়াছে যে, রোগীগুলি যীশুকে বিশ্বাস করার ফলে রোগমুক্ত হইয়াছিল। রোগীরা যীশুকে কি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল? নবী বলিয়া অথবা তাঁহার অভিশপ্ত কুরবাণীতে? অতএব, প্রায়শ্চিত্তবাদ ও উহার উপর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা কি এবং এই মতবাদ কোথা হইতে আসিল?

যীশু বলিয়াছেন যে, তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে যদি কাহারো সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকে তাহা হইলে সেই সব অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইতে পারিবে যাহা তিনি দেখাইয়াছেন (মথি ১৭ঃ ২০, ২১ ; যোহন ১৪ঃ১২)। এইরূপে কেরামতির আশিসের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া প্রথম তিন শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানগণ তৎকালীন শাসকগণের উৎপীড়নের ভয়ে Catacomls তথা ভূগর্ভে গুহার মধ্যে জীবন কাটাইলেন কেন? খ্রীষ্টান ভাইগণ আমাদিগকে জানাইবেন কি, গত দুই হাজার বৎসরে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কতজন এই সকল অলৌকিক ক্রিয়া দেখাইয়া ছিলেন এবং বর্তমানে কেই কি আজ ঐ সকল ক্রিয়া দেখাইতে পারেন? যদি পারেন, আমরা তাহাকে ইহার জন্য সসম্মানে আহ্বান জানাইতেছি। যদি কেহ ইহা দেখাইতে না পারেন তাহা হইলে এই গল্পগুলি ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির আকারে তুলিয়া ধরার কি কোন যৌক্তিকতা আছে? যিশুর অনুরূপ লীলা দেখাইতে না পারিলে এগুলি প্রচার করা কি বেকার নয়? এই গল্পগুলি যে শুনাইবে তাহারও যেমন ইহাতে কোন উপকার নাই

তেমনি যে শুনিবে তাহারও ইহাতে কোন উপকার নাই। প্রসঙ্গক্রমে এখানে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখের একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে অমৃতসরে বাহাস বা বিতর্ক হইতেছিল। খৃষ্টধর্মের পক্ষে ছিলেন হেন্‌রী মার্টিন ক্লার্ক ও তাহার সহযোগীগণ এবং ইসলাম ধর্মের পক্ষে ছিলেন হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এবং তাঁহার সহযোগীগণ। অতঃপর ২৯শে তারিখে মুবাহেসার অর্থাৎ বিতর্কের সময় খৃষ্টানরা গোপনে গোপনে একটি অন্ধ, একটি বধির ও একটি খঞ্জকে মুবাহেসার স্থানে একদিকে বসাইয়া রাখিল। তারপর তাহারা তাহাদের বক্তৃতায় হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিল: "আপনি ঈসা-মসিহ্ হওয়ার দাবী করেন। নিন, এই অন্ধ, বধির ও খঞ্জ ব্যক্তিরা আছে, মসিহ্‌র ন্যায় তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া আরোগ্য করুন। হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ) তাহার প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, আমিতো একথা বিশ্বাস করিনা যে, মসীহ্ এই প্রকারে স্পর্শ দ্বারা বধির, অন্ধ ও খঞ্জদিগকে বাস্তবে ভাল করিতেন। কাজেই আমার নিকট এইরূপ দাবী করিবার কোনই যৌক্তিকতা নাই। অবশ্য আপনারাই মসিহ্‌র এই প্রকারের মোজেযায় বিশ্বাস করেন। উপরন্তু আপনারা ইহাও তো বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যক্তির মধ্যে একটি সরিষার পরিমাণ ঈমানও থাকিবে. সেও ঐ সমস্ত মোজেযা প্রদর্শন করিতে পারিবে যাহা মসিহ্ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং আমি আপনাদের নিকট বড়ই কৃতজ্ঞ যে আপনারা আমাকে বধির, অন্ধ ও খঞ্জদিগকে তালাশ করা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন আপনাদের উপহার আপনাদের সম্মুখে রাখা হইতেছে। এই বধির, অন্ধ ও খঞ্জ আপনাদের সম্মুখে আছে। যদি আপনাদের কাহারো মধ্যে একটি সরিষার সমতুল্য ঈমানও থাকে তবে মসীহ্‌র সুন্নত অনুসারে আপনারা ইহাদিগকে আরোগ্য করুন। হযরত মীর্যা সাহেব (আঃ) ইহা বলা মাত্র পাদ্রীদের হুঁস উড়িয়া গেল। তাহারা তৎক্ষণাৎ ইশারা করিয়া উহাদিগকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন। মৌলভী আব্দুল কাদের প্রণীত 'হায়াতে তাইয়েবা" পুস্তকের ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা এবং হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর প্রণীত 'আহমদ চরিত" পুস্তক দ্রষ্টব্য এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মূল পুস্তক 'জংগে মুকাদ্দস' এর ১৫০-১৫৮ ও ২৯১-২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

—মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব,
আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

সেই জ্যোতিতে (সাঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন।
—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)]

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫ ২)

(৪) আমেরিকান মিথ্যা দাবীকারক জন আলেকজাণ্ডার ডুই সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা

অষ্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আলেকজাণ্ডার ডুই ছিলেন আমেরিকার নাগরিক। তিনি একজন ধর্ম শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি মানুষের রোগ-মুক্তি দিতে পারেন বলে দাবী করেন এবং অল্পকালের মধ্যে নিজেই একটি সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন। তখন ছিল ১৮৯২ ইং সন। কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯০১ সনে যীশু-খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বসুরী হিসেবে তিনি স্বয়ং দাবী করেন—ঠিক যেভাবে ইলিয়াস বা (এলীয়) যীশুখ্রীষ্টের প্রধম আগমনের পূর্বসুরী ছিলেন।

ঐ সময়ে যীশুখ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমণ বহুল আলোচিত বিষয় ছিল। ধর্মীয় পুস্তকাবলীতে তাঁর দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীসমূহে উল্লেখিত প্রকাশমান নিদর্শনাবলী দেখে বহু ধর্মপ্রাণ হৃদয় অধীরভাবে অপেক্ষমান ছিল। তাই ডুইয়ের দাবী ঘোষিত হওয়ার ফলে তার অনুসারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগলো। তিনি শীঘ্রই জমি খরিদ করে 'জিয়ন' (Zion) নামে একটি শহর স্থাপন করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে এই 'জিয়ন' শহরে যীশু পুনরাগমণ করবেন। এখ'নে তিনি মুকুটহীন একজন রাজার ন্যায় শাসন পরিচালনা করতে লাগলেন।

আলেকজাণ্ডার ডুই ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে গালাগালী শুরু করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, মুসলমানদেরকে অবশ্যই খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। হযরত মীর্যা সাহেব যখন এইসব কথা শুনলেন তখন তিনি ইসলামের সত্যতা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে ডুইয়ের কাছে লিখলেন এবং তাকে সত্যাসত্য নিরূপনের জন্য 'মুবাহেলা' (প্রার্থনাযুদ্ধের) জন্য চ্যালেঞ্জ করলেন। ১৯০২ সনের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৩ সনের শেষ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকগুলো সংবাদ-পত্র হযরত মির্যা সাহেবের এই সকল লেখা এবং পত্রালাপের উপর মন্তব্য করতে থাকেন। এই সকল সংবাদ-পত্রের অনেকগুলো কাটিং কাদিয়ানে পৌছতে থাকে এবং স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ লোক হযরত সাহেবের চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিল। অন্যদিকে আলেকজাণ্ডার ডুই উক্ত চ্যালেঞ্জের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার এবং উহার ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা জারী রাখলেন। ১৯০৩ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁর পত্রিকায় ডুই লিখলেন :

"আমি খোদার কাছে প্রার্থনা করছি যে, ইসলাম যেন ধরাপৃষ্ঠ হতে অতিশীঘ্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। হে খোদা, আমার এই প্রার্থনা গ্রহণ করো। হে খোদা, ইসলামকে ধ্বংস করো।" ৫ই আগষ্ট, ১৯০৩ সনে তিনি লিখলেন :

"মানুষের মাঝে যে কলঙ্ক-চিহ্ন রয়েছে তা জিয়নের হাতে চির-বিদায় লাভ করবে।" হযরত মীর্যা সাহেব দেখলেন যে ডুই কিছুতেই ইসলাম বিরোধী তৎপরতা থেকে বিরত হচ্ছে না, তখন তিনি আর একটি প্রচার-পত্র লিখলেন যার নাম দিলেন 'ডুই এবং পিগট সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (পিগট ছিল ইংল্যাণ্ড থেকে আর একজন প্রতারক) এই প্রচার-পত্রে হযরত মীর্যা সাহেব লিখলেন যে, তিনি আল্লাহতা'লা কর্তৃক তৌহীদ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকাবাসীদের জন্য তিনি একটি নিদর্শন দেখাবেন। সেই নিদর্শনটি হলো এই যে, যদি ডুই তাঁর সঙ্গে মুবাহেলায় অংশ নেয় অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, তাহলে "অতি কষ্টে এবং দুঃখতাপে" ডুইকে ইহজগত হতে বিদায় নিতে হবে। হযরত সাহেব তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য সময় সীমা দিলেন এবং ঐ প্রচার-পত্রের শেষে লিখলেন :

"নিশ্চিত হও— ডুইয়ের জীবনে মহা-বিপদ আসন্ন ... হে খোদা, ডুই এবং পিগটের ছল-চাতুরী যেন সকল লোকের কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।"

হযরত মীর্যা সাহেবের এই ঘোষণা-পত্র ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। Glasgow Herald এবং New York Commercial Advertiser হযরত সাহেবের ঘোষণার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করে।

সেই সময় ডুইয়ের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য তারকা শীর্ষস্থানে বিরাজমান ছিল। তাঁর চারিদিকে ছিল অনেক বিত্তবান অনুসারী অগণিত চাকর বাকর এবং তেমনি হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে উঠেছিল তার দৈহিক গঠন। অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে তিনি লিখলেন :

'জনৈক মুহাম্মদী মসীহ্ বার বার আমার কাছে লিখেছে যে, যীশুখ্রীষ্ট কাশ্মীরে সমাহিত আছেন এবং লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমি তার কথার উত্তর দেই না কেন। তোমরা কি মনে করো যে, আমি এই ধরনের মশা-মাছির উত্তর দিবো? আমি যদি তাদের উপর পা রাখি তাহলে তাদের জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তাদেক উড়ে যেতে দেই যাতে তারা বেঁচে যায়।"

ডুইয়ের এই দম্ভোক্তি থেকে বুঝা গেল যে, শেষ পর্যন্ত সে হযরত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ তথা মুবাহেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই পর্যায়ে ডুইয়ের মুবাহেলার মধ্যে আসাটা পরোক্ষভাবে পূর্ণ হয়েছিল। ফলতঃ হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঐশী শাস্তি নিজের উপর নিজেই ডেকে এনেছিল। তার দম্ভ, বাহ্যিক ছলনা-প্রতারণা সকল মাত্রা অতিক্রম করতে লাগলো এবং এক পর্যায়ে সে হযরত মীর্যা সাহেবকে "নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ" বলে উল্লেখ করতঃ লিখলো :

"আমি যদি পৃথিবীতে খোদার প্রেরিত নবী না হই, তবে কেহই প্রেরিত নবী নহে।" ১৯০৩ সনের ডিসেম্বরে সে প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। সে ঘোষণা করলো: "একজন ফেরেস্তা তাকে জানিয়েছে যে, সে তার শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে!"

"এর দ্বারা ডুই এমন ভবিষ্যদ্বাণীর দাবী করলো যা হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এই পর্যায়ে ডুই প্রত্যক্ষভাবে হযরত মীর্যা সাহেবের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। হযরত মীর্যা সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন খোদাতায়ালার বিচারের জন্য।

শীঘ্রই প্রথম নিদর্শন প্রকাশিত হলো। প্রথমতঃ ডুইয়ের পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিল যে পা দিয়ে সে খোদার মসীহের উপর আঘাত করতে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিল। পক্ষাঘাত ভালভাবেই তাকে আক্রমন করলো। তবে কিছুকাল পর সে কিছুটা সেরে উঠলো। কিন্তু দু'মাস পরই পুনরায় পক্ষাঘাত দেখা দিল এবং সে শয্যাশায়ী হলো। পরিশেষে সে একটা স্বাস্থ্য-নিবাসে চলে গেল।

"খোদার ক্রোধানলে সে জ্বলতে লাগলো। ডুইয়ের অনুসারীরা ভাবতে লাগলো যে, যে ডুই অন্যদেক সুস্থ করতে পারে বলে দাবী করে সে নিজেকে কেন সুস্থ করতে পারছে না। অনুসারীরা খোঁজ খবর নিতে লাগলো—বিশেষতঃ ঐ সকল গোপন কক্ষগুলো পরীক্ষা করলো যেগুলোতে এতদিন যাবৎ কেউ প্রবেশ করতে পারতো না। তারা সেখানে গোপনীয়ভাবে রক্ষিত মদের বোতল দেখলো। ডুইয়ের স্ত্রী এবং পুত্র জানালো যে, ডুই সংগোপনে মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল এবং প্রায়ই মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করতো। জনসাধারনের কাছে সে মদ্যপান বর্জন নীতি প্রচার করতো—এমনকি তামাক সেবনও নিষিদ্ধ ছিল। তার স্ত্রী আরো জানালো যে, একজন ধনী বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য ডুই 'বিগ্যামী' বা এককালে দুই স্ত্রী রাখার নীতি আইন সিদ্ধ বলে প্রচার শুরু করেছিল।

অনুসারীরা ডুইয়ের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। অর্থ সম্পদ আত্মসাতের অনেক ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলো—এমনকি শহরের কোন কোন মেয়েকে উপহার দেওয়ার জন্য অর্থ আত্মসাতের ঘটনাও প্রকাশ হয়ে পড়লো। এভাবে আলেকজাণ্ডার ডুই তার সম্মানিত মর্যাদা হতে গদিচ্যুত হলো।

ইতিমধ্যে ডুই স্বাস্থ্য-নিবাস হতে ফিরে এসে তার ডুবন্ত তরীকে বাঁচাবার জন্য পুনরায় চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু সে কাউকে বিশেষভাবে তার দিকে আকর্ষণ করতে পারলো না। যৎসামান্য ভরণ-পোষণ ভাতা ব্যতীত আদালত তাকে কোন সম্পত্তিই ভোগ করতে দিল না। পক্ষাঘাতের ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল—তাকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে কৃষ্ণকায় চাকরের সাহায্যে চলা-ফেরা করতে হতো। ক্রমেই তার দুর্দশা বেড়ে চললো। কার্যতঃ অল্প সময়ের মধ্যে তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলো। কথা-বার্তায় অসংলগ্নতা দেখা দিল। সামান্য যে কয়েক জন অনুসারী অবশিষ্ট ছিল তারাও তাকে ফেলে চলে গেল। এইভাবে দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে অবশেষে আলেকজাণ্ডার ডুই মরে গেল—ঠিক যে ভাবে ৮ই মার্চ, ১৯০৪ সনে হযরত মীর্যা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এই সকল ঘটনা সংবাদ-পত্র সমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। Dunville Gazette জুন ১৯০৪ লিখেছে : "Ahmad and his adherents may be pardoned for taking some credit for the accuracy with which the prophecy was fulfilled a few months ago."

—"আহমদ (অর্থাৎ হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদেক এই কৃতিত্বের জন্য ক্ষমা করা উচিত—এই কৃতিত্ব এজন্য ছিল যে কয়েক মাস আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা নির্ভুলভাবে পূর্ণ হয়েছে।"

Truth Seeker ১৯০৪ সনের ১৫ই জুন সংখ্যায় লিখেছে :

"The Qadian man predicted that if Dowie acepted the challenge he shall leave the world before my eyes with great sorrow and forment. if Dowie declined, the Mirza said, the end would only be deferred ; death awaited him just the same and calamity will soon overtake Zion. That was the grand prophecy : Zion should fall and Dowie die before Ahmad"

অনুরূপভাবে আমেরিকার বোষ্টন শহরের Herald পত্রিকা ১৯০৪ সনের ২৩শে জুন সংখ্যায় লিখেছে :

"Dowie died a miserable death with Zion city forn and frayed by internal dissensions." "ডুই মরেছে—একটি শোচনীয় মৃত্যু। সেই সঙ্গে জীয়ন শহর আভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে এবং কলহ কোন্দলে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।"

এই ঐশী নিদর্শন পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদেক যুগ যুগ ধরে একথাই স্মরণ করিয়ে দিবে যে, প্রার্থনা যুদ্ধে অর্থাৎ দোওয়ার কবুলিয়তের প্রতিযোগিতায় একজন খ্রীষ্টধর্মের অনুসারী চরমভাবে পরাজিত হয়েছে একজন ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীর কাছে। (ক্রমশঃ)

["দাওয়াতুল আমীর" শীর্ষক গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান]

দোওয়ার আবেদন

আমার বাম পায়ের বুড় আঙ্গুলটা অবস অবস্থায় আছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানাহ রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। আশু আরোগ্যের জন্য পবিত্র রমজানে সকল ভাই-বোনদের নিকট দোওয়ার আকুল আবেদন করিতেছি।

খাকছার—

আবদুল মতিন (নাটাই)

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইন্তেকালে তাঁহার সম্পর্কে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও খ্যাতনামা মুস্লিম ও অমুস্লিম চিন্তাবিদগণের অভিমত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫) লাহোরের আর্য সমাজী পত্রিকা 'ইন্দার' নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করে :

"মির্যা সাহেব তাঁহার একটি গুণের ক্ষেত্রে (হযরত) মুহাম্মদ সাহেব (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন, আর সেই গুণটি ছিল তাঁহার অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা ; যদিও উহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। আমরা আনন্দিত যে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উহা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই।"

(৬) এলাহাবাদ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করে :

"যদি বিগত যুগের বণী ইস্রাইলী নবীগণের মধ্য হইতে কোন নবী উর্ধলোক হইতে নামিয়া বা ফিরিয়া আসিয়া এ যুগে জগতের বুকে স্বীয় প্রচার-কার্য সম্পাদন করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই বিংশ শতাব্দীর অবস্থা ও পরিস্থিতির মধ্যে (হযরত) মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী অপেক্ষা অধিকতর অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেন না। ...

স্বীয় দাবীর ক্ষেত্রে মির্যা সাহেবের কখনও সামান্যতম সন্দেহও ছিল না, এবং তিনি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতেন যে, তাঁহার উপর আল্লাহর বাণী নাজেল হয় এবং তাঁহাকে এক অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দান করা হইয়াছে। একবার তিনি তাঁহার মোকাবেলায় নিদর্শন দেখাইবার জন্য বিশপ ওয়েলডনকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বিশপ হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে মির্যা সাহেব স্বয়ং নিদর্শন দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন এবং সেই বিষয়ে জামানার অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি যে কোন প্রকার ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই তাহার সম্বন্ধে বিশপ সাহেবের সর্ব প্রকার সন্তুষ্টিবিধানের প্রস্তুতি জ্ঞাপন করেন।

যাহারা ধর্ম জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা নিজ স্বভাবগুণে ইংল্যাণ্ডের লর্ড বিশপের তুলনায় মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের সহিত অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। মোটকথা, কাদিয়ানের নবী সেই সকল ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা সর্বদা জগতে আসেন না।"

('পাইওনিয়ার' ৩০শে মে, ১৯০৮ইং)

(নোট : উদ্ধৃতিটিতে উল্লেখিত বিশপ ওয়েলডন কলিকাতায় ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ ইং পর্যন্ত ছিলেন কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ নামটি ভুলবশতঃ লাহোরের লর্ড বিশপ লেফরয়ের স্থলে লিখা হইয়াছে।—অনুবাদক)

৭। 'অল ইণ্ডিয়া ক্রীশ্চেন এ্যসোসিয়েশন'-এর সেক্রেটারী মিঃ ওয়াল্টর, এম, এ, তাঁহার প্রণীত 'আহমদীয়া মুভমেন্ট' পুস্তকে লিখিয়াছেন :

"ইহা সর্বতঃ প্রমাণিত যে, মীর্যা সাহেব স্বীয় স্বভাব-গুণে সরল ও উদার এবং মহানুভব ছিলেন। তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে পরিচালিত কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের

মোকাবেলায় তিনি যে তাঁহার নৈতিক বল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীরূপে প্রশংসনীয়। একমাত্র আকর্ষণীয় চুম্বকশক্তি ও আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিই সেই সকল লোকের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়, যেরূপ কমপক্ষেও তাঁহার মান্যকারী দুই ব্যক্তি আফগানিস্তানে নিজেদের আকীদার উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ থাকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন. তথাপি মির্যা সাহেবের অঞ্চল পরিত্যাগ করেন নাই। আমি প্রবীণ আহমদীদের কয়েকজনকেই তাহাদের আহমদী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের বেশীর ভাগই মির্যা সাহেবের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রভাব ও আকর্ষণ শক্তি এবং চুম্বক সুলভ ব্যক্তিত্বকেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মীর্যা সাহেবের মৃত্যুর আট বৎসর পরে ১৯১৬ইং সনে আমি কাদিয়ানে গিয়া এরূপ এক জামাত দেখিতে পাই যাহাদের মধ্যে ধর্মের জন্য সত্যিকার ও শক্তিশালী উদ্যম ও উদ্দীপনা বিরাজমান, যাহা হিন্দুস্তানের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আজ পরিলক্ষিত হয় না। কাদিয়ানে যাইয়াই মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারে যে, একজন মুসলমান ঈমান ও মহব্বতের যে রুহ্ সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে বৃথা তালাশ করে উহা সে একমাত্র আহমদের জামাতের মধ্যে পর্যাপ্ত ও বিপুল পরিমাণে পাইবে।"

(৮) অমৃতসরের তৎকালীন 'উকীল' পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল :

"ক্যারেক্টার বা চরিত্রের দিক দিয়া মির্যা সাহেবের সমগ্র জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালিমার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। তিনি এক পরম পবিত্র ও মুত্তাকীর জীবন যাপন করিয়াছেন। ... মোট কথা, মির্যা সাহেব তাঁহার জীবনের পঞ্চাশ বৎসর কালের মধ্যেই চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ এবং দ্বীনে-ইসলামের সাহায্য-সমর্থন ও সেবা কার্যের দিক দিয়া সমগ্র হিন্দুস্তানের মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর মনোনীত বিশিষ্ট বান্দা হিসাবে এক অতি প্রশংসনীয় উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন।" ('উকীল পত্রিকা, ৩-শে মে ১৯০৮ ইং)

(৯) লাহোরের বিখ্যাত দৈনিক 'জমিনদার' পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক মৌলবী জাফর আলী খানের পিতা ও উক্ত পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক মুনশী সেরাজউদ্দীন আহমদ লিখিয়াছিলেন :

"মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব প্রায় ১৮৬০ ইং কিংবা ১৮৬১ ইং সনে ছিলা শিয়ালকোটে মুহাররের পদে চাকুরী করিতেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ২২/২৩ বৎসর ছিল। আমরা চাক্ষুষ সাক্ষ্য হিসাবে বলিতেছি যে, যৌবনকালেও তিনি পরম সৎ, সালেহ ও মুত্তাকী বুজর্গ ছিলেন। চাকুরীগত কর্ম-বিরতির পর তাঁহার বাকী সবটুকু সময়ই ধর্মীয় গ্রন্থাবলী অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। সর্বসাধারণের সহিত তিনি খুব কম মেলা-মেশা করিতেন। ১৮৭৭ সনে একবার কাদিয়ানে যাইয়া তাঁহার নিকট মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। সেই সময়ও তিনি এবাদত-ওয়ায়েফ এবং সাধনায় এতই নিমগ্ন ও আত্মবিভোর থাকিতেন যে, মেহমানদের সঙ্গেও খুব কম কথা-বার্তা বলিতেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে মির্যা সাহেবের দাবী বা এলহাম সমূহ আমাদের মানার এবং বিশ্বাসী হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে নাই, তথাপি আমরা তাঁহাকে একজন অতি পবিত্র মুসলমান বলিয়া মনে করিতাম।"

(দৈনিক জমিনদার, লাহোর, ৮ই জুন, ১৯৮০ ইং)

অনুবাদ ও সংকলন : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সংবাদ ঃ

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের ঈমানবর্ধক সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

পাশ্চাত্যের প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃত সকলজাতির নিকট কুরআন করীমের শাশ্বত বাণী পৌঁছাইবার এবং তাহাদের অন্তরে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্ব-আহমদীয়তের কেন্দ্র রাবওয়া হইতে ২৬শে জুন ১৯৮০ ইং তারিখে ভোর ৬ ঘটিকায় মটরযোগে রওয়ানা হইয়া প্রথমে লাহোর পৌঁছান, তারপর একই দিনে ১১টা ৩০ মিনিটে বিমান যোগে লাহোর হইতে রওয়ানা হইয়া বেলা এক ঘটিকায় করাচী পৌঁছান।

উল্লেখ যোগ্য, রাবওয়া, শেখোপুরা, লায়েলপুর ও লাহোরের অসংখ্য আহমদী তাঁহাদের প্রিয় ইমামকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত দোওয়ার মাধ্যমে বিদায় দেন, অনেকে হুজুরকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে করাচী পর্যন্ত সফর করেন। ২৮শে জুনের রাত্রিতে হুজুর (আইঃ) ৭ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত কাফিলা সহ পি-আই-এ বিমান যোগে করাচী হইতে রওয়ানা হইয়া আল্লাহর ফজলে মঙ্গলমত ফ্রাংকফোর্ট (পঃ জার্মানী) পৌঁছান।

২৮শে জুন করাচীতে হুজুর (আইঃ) করাচী জামাতের এক সমাবেশে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় এক ঘণ্টা স্থায়ী তাঁহার সারগর্ভ ভাষণে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে আহমদীয়াত বিস্তারের ফলে বিভিন্ন দেশের আহমদী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে বিশেষতঃ অমুস্লিম পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন মেয়েদের ওলি নিযুক্ত করণের ক্ষেত্রে সমস্যাবলীর ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাধান এবং আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘোষিত পরিকল্পনা ও আসন্ন গালাবায়ে ইসলামের প্রেক্ষিতে উহার উদ্দেশ্য ও গুরুত্বের উপর বিশদরূপে আলোকপাত করার পর তাঁহার সাম্প্রতিক বিদেশ সফরের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে আলোকপাত করিয়া বলেন : "এই সফর বিবিধ কারণে জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি আল্লাহতায়ালা এরূপ কতকগুলি ফজল বর্ষণ করিয়াছেন এবং বাহির্দেশে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের উন্নতির এরূপ কতকগুলি পথ খুলিয়াছেন যে গুলির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে গালাবায়ে ইসলামের কাজকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে যাওয়া জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর কিছুটা বিস্তারিত আলোকপাত করিতে গিয়া হুজুর বলেন যে, ১৯৭০ ইং সনে যখন আমি স্পেনে গেলাম, তখন আমি চেষ্টা করি যাহাতে সম্ভব হইলে, সেখানকার কোন একটি ক্ষুদ্র জরাজীর্ণ অনাবাদী মসজিদ নামাজ আদায়ের জন্য আমরা পাইয়া যাই। কিন্তু সেখানকার সরকার যদিও উহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন কিন্তু পাদ্রীদের তীব্র বিরোধিতার কারণে তাহা কার্যকরী করিতে পারেন নাই। উহার পর দশ বৎসরের মধ্যে সেখানে এরূপ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহার ফলে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে 'কারতাবা' শহরের সন্নিকটে এক খণ্ড জমি দান করিয়াছেন

যাহা আমরা ক্রয় করিয়া লইয়াছি এবং সরকার সেখানে মসজিদ নির্মাণ করার অনুমতিও দান করিয়াছেন। খোদাতায়ালার ফজলে সেখানে আমরা এত পরিমাণ জমি পাইয়াছি যেখানে আমরা মসজিদ নির্মাণ করার পর উহাকে আবাদ রাখার উদ্দেশ্যে উহার সন্নিকটে ছয়টি ফ্লাটও নির্মাণ করিতে পারিব যাহাতে সেখানকার আহমদী পরিবার সমূহ সেগুলিতে বসবাস পূর্বক মসজিদটিকে এক ও অদ্বিতীয় খোদার এবাদতের দ্বারা আবাদ রাখিতে পারেন, এবং এইরূপে ঐ মসজিদটি স্পেনে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মারকাজ বা কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে।

হুজুর আরও বলেন যে, স্কেণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে নরওয়েতে সর্বাপেক্ষা বড় জামাত রহিয়াছে কিন্তু সেখানে আমাদের কোন মসজিদও ছিল না এবং কোন মিশন-হাউসও ছিল না—ডেনমার্কে আমাদের মসজিদ এবং মিশন-হাউস আছে এবং সুইডেনেও মসজিদ ও মিশন-হাউসের জন্য এমারত নির্মাণ করা হইয়াছে কিন্তু নরওয়েতে জমি না পাওয়ার দরুণ আমরা মসজিদ ও মিশন-হাউস নির্মাণ করিতে পারিতেছিলাম না। সম্প্রতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ওস্লোর শহরতলিতে একটি বিরাট ত্রিতল এমারত দান করিয়াছেন, যাহা মসজিদ ও মিশন-হাউস রূপে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং সেখানে উন্নতির আরও নুতন পথ খুলিতে পারে।

হুজুর বলেন, এমনিধারায় পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে যেখানে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং হাসপাতাল সমূহ খোলার তওফিক দিয়াছেন, সেখানে উন্নতির আরও নুতন নুতন পথ খুলিতেছে এবং সেখানকার জনসাধারণ এবং সরকার সমূহ আমাদিগকে আরও নতুন স্কুল ও হাসপাতাল খোলার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন এবং তজ্জন্য সর্ব প্রকার সহায়তা দানের আশ্বাসও প্রদান করিতেছেন। নাইজেরিয়া হইতে সম্প্রতি জানান হইয়াছে যে, সেখানে আল্লাহতায়ালা জামাতকে বিভিন্ন অঞ্চলে আরও তিনটি বড় বড় মসজিদ তামীর করার তওফিক দিয়াছেন, এবং তাহাদের খাহেশ, এই সফরের সময়ে আমি যেন সেইগুলির উদ্বোধন করি।

আল্লাহ্‌তায়ালার নিত্য নতুন ফজল ও কৃপাসমূহ অতি ঈমান বর্ধক পদ্ধতিতে উল্লেখ করার পর, পরিশেষে হুজুর বলেন, আমাদের বহুবিধ কাজ করিতে হইবে। শক্তি ও সামর্থ আমাদের নাই এবং আমরা অত্যন্ত দুর্বল, কিন্তু যে মহামহিয়ান ও সর্ব-শক্তিমান খোদার অঞ্চল আমরা ধারণ করিয়াছি তিনি দুর্বল নহেন। দুনিয়া এখন ইসলামী শিক্ষার জন্য তৃষ্ণার্ত, এবং উহা তাহাদের প্রয়োজনও।

কিন্তু অবস্থা এই যে, উক্ত কার্য সমাধার জন্য যদি এক অর্বুদের একাংশ চেষ্টার প্রয়োজন থাকিয়া থাকে, তবে সেই একাংশ চেষ্টা করার শক্তিও আমাদের মধ্যে নাই। সুতরাং আমাদের জন্য জরুরী, আমরা যেন সম্যক কুদরত ও শক্তির অধিকারী খোদাতায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনায় ব্যপৃত থাকি এবং সর্বদা তাঁহারই সমীপে ঝুকিতে থাকি। আমি রাবওয়ায়ও

তাহরীক করিয়াছিলাম, এখন আবারও আপনাদিগকে বলিতেছি যে, আপনারা সাতদিন ব্যাপী খাসভাবে দোওয়া করুন, যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার অশেষ ফজলের দ্বারা এই সফর ও দওরাকে সর্বতঃ সফল ও কামিয়াব করেন এবং গালাবায়ে-ইসলামের পক্ষে ইহাকে অত্যন্ত ফায়দা জনক ও কল্যাণকর এবং ফলপ্রসু সাব্যস্ত করেন।

উক্ত ভাষণের পর হুজুর (আইঃ) উপস্থিত মণ্ডলীসহ অতি বিগলিত চিত্তে দোওয়া করেন। তারপর উচ্চৈস্বরে 'আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

ফ্রাঙ্ক ফোর্টে হুজুরকে প্রানঢালা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন ঃ

সহগামী কাফেলা সহ হুজুর (আইঃ) ২৯শে জুন প্রত্যুষে করাচী হইতে সোয়া দুই ঘটিকায় কে-এল-এম বিমান যোগে ফ্রাঙ্কফোর্ট রওয়ানা হন। করাচীর আমীর সাহেবের নেতৃত্বাধীনে বহু স্থানীয় বন্ধু, রাবওয়ার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ এবং লাহোর, শেখুপুরা ও রাওলপিণ্ডি হইতে আগত বন্ধুগণ আন্তরিক ও আবেগ ভরা দোওয়ার মাধ্যমে হুজুরকে বিদায় জ্ঞাপন করেন। হুজুর তাঁহার সহযোগী কাফেলা সহ জার্মানীর সময় অনুযায়ী সকাল পৌণে সাতটায় ফ্রাঙ্কফোর্টে পৌছান। বিমানবন্দরে উপস্থিত পঃ জার্মানীর ইনচার্জ মোবাল্লেগ মৌঃ মনসুর আহমদ খান ; হ্যামবুর্গের মোবাল্লেগ মৌঃ লঈক মুনির সাহেব এবং আমাদের জার্মান নও-মুসলিম ভ্রাতা জনাব হেদায়তুল্লাহ্‌ হাবশ বিমানের দরোজা পর্যন্ত গিয়া হুজুরকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর হুজুর (আইঃ) তাঁহাদের সমভিব্যাহারে এয়ার পোর্ট হইতে মোটর কার যোগে ফ্রাঙ্কফোর্ট স্থ মসজিদে-নূর ও মিশন হাউস গমন করেন। সেখানে দুই শতাধিক আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হুজুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনার্থে সারিবদ্ধ হইয়া অপেক্ষমান ছিলেন। হুজুর সেখানে পৌছান মাত্র তাঁহারা ইসলামী না'রা সমূহ উত্থাপন করিয়া মহা উদ্দীপনার সহিত সম্বর্ধনা জানান। হুজুর তাহাদের সকলের সহিত মুসাফা করেন এবং প্রত্যেকের সহিত প্রীতিপূর্ণ আলাপও করেন।

ফ্রাঙ্কফোর্টে জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে হুজুরের ভাষণ ঃ

৭ই জুলাই তারিখে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) পঃ জার্মানীর শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ফ্রাঙ্কফোর্টে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। উক্ত সম্মেলনটি দুই ঘণ্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে এবং বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক ইহাতে যোগদান করেন। ইসলাম ও আহমদীয়ত সম্বন্ধে তাঁহারা বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হুজুর সেগুলির সন্তোষজনক উত্তর দান করেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে উক্ত সম্মেলন সুপ্রভব বিস্তার করিয়াছে। ফ্রাঙ্কফোর্টের বিভিন্ন পত্রিকায় ব্যাপকরূপে হুজুরের বক্তব্যসমূহ প্রচারিত হয়।

হেমবোর্গ এবং ফ্রাঙ্কফোর্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার চারশত আহমদীর সহিত হুজুরের সাক্ষাৎ ঃ

৫ই জুলাই তারিখে হুজুর (আইঃ) ফ্রাঙ্কফোর্টের আশ-পাশের অঞ্চল হইতে আগত দুইশত বন্ধুকে সাক্ষাৎদান করেন এবং তাহাদিগকে অমূল্য উপদেশাবলী দান করেন। ইহার পরবর্তী দিন—৬ই জুলাই তারিখে হুজুর হেমবোর্গের এলাকা হইতে আগত ২শত বন্ধুকে সাক্ষাৎ দান করেন। প্রতিটি সম্মেলিত সাক্ষাৎ-অনুষ্ঠান দেড় ঘন্টা ব্যাপী অব্যাহত থাকে। প্রতিটি আহমদী তাঁহাদের প্রিয় ইমামকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত ও তুষ্ট হন।

ফ্রাঙ্কফোর্ট মিশনের পক্ষ হইতে হুজুরের সম্মানে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রদূত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের যোগদান ঃ

১০ই জুলাই ১৯৮০ তারিখে ফ্রাঙ্কফোর্ট আহমদীয়া মিশনের পক্ষ হইতেআয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় হুজুর (আইঃ) বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথী হিসাবে যোগদান করেন। উক্ত সভায় যোগদানকারী ৪০জন বিষেশ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রদূত প্রফেসার, ডাক্তার ও পাদ্রীগণ ব্যতীত সাংবাদিক প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শহরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বর্গ। উক্ত অনুষ্ঠানে ভেঞ্জভেয়েলার কাউন্সেলও উপস্থিত ছিলেন। হুজুর মেহমানদের মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া সকলকে সাক্ষাৎ দান পূর্বক দুই ঘন্টা ব্যাপী তাহাদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে বাক্যালাপ করেন। অনেকে হুজুরের সহিত মিলিত হইয়া নিজেরা আলাপ-আলোচনা করেন।

৪ঠা ও ১১ই জুলাই শুক্রবার ফ্রাঙ্কফোর্টের মসজিদে-নূরে হুজুর জুমার নামাজ আদায় করেন এবং যথাক্রমে নামাজের পূর্বে দেড় ঘন্টা ও পৌণে দুই ঘন্টা স্থায়ী জুমার খোৎবা প্রদান করেন। প্রথমবারের জুমার খুৎবায় হুজুর তাঁহার জারীকৃত বিভিন্ন তাহরীক বিশেষতঃ শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার কল্যান ও অবদানসমূহ এবং গালাবায়ে ইসলামের পটভূমিকায় উহাদের অপরিসীম গুরুত্বের উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেন। পরবর্তী জুমার খুৎবায় তিনি 'ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা' বিষয়ে বিশদ আলোকপাত করেন।

ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে জিউরিচ যাত্রা ঃ হুজুর এখন আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন ঃ

১২ই জুলাই ১৯৮০ হুজুর (আইঃ) আল্লাহতায়ালার ফজলে ফ্রাঙ্কফোর্ট হইতে মোটরকার যোগে মঙ্গলমত জিউরিচ (সুইজারল্যাণ্ড) পৌছান। হুজুর আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী সদাসর্বদা দোওয়া জারী রাখিবেন যে আল্লাতায়ালা যেন হুজুরকে সম্পূর্ণ আরোগ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করেন এবং ইসলামের পবিত্র বাণীকে গৌরবান্বিত করার এবং এশায়াতে কুরআনের সুমহান উদ্দেশ্যে তাঁহার এই বিদেশ সফরকে সর্বতঃ সাফল্যমণ্ডিত করেন। আমীন।

(দৈনিক 'আল ফজল' হইতে সংকলিত)—

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

এস, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্ব

(১) মেজর জেনারেল আমজাদ আহমদ খান চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও মোহতারম আলী আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের পৌত্র আজহার আহমদ খান চৌধুরী জিনাইদহ কেডিট কলেজ হইতে যশোর সেকেণ্ডারী বোর্ডের এস-এস-সি পরীক্ষায় আল্লাহতায়ালার ফজলে ৪৫০০ ছাত্রের মেরিট লিষ্টে ১৮তম স্থান এবং প্রিইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপে ৬টি লেটার সহ ১ম স্থান লাভ করিয়াছে। আল-হামদুলিল্লাহে।

(২) তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের চতুর্থ পুত্র মোদাব্বের আহমদ মুকুট এবারের (১৯৮০) কুমিল্লা বোর্ডের এস, এস, সি পরীক্ষায় মানবিক গ্রুপে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। উল্লেখ্য, মোদাব্বের আহমদ প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রথম স্থান অধিকার এবং জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায়ও বৃত্তি লাভ করে।

(৩) তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোখলেছ আহমদী জনাব ফজলুল হক ভূঞা সাহেবের পুত্র রফিক আহমদ ভূঞা (মুক্তা) এবারের এস, এস, সি পরীক্ষায় তিনটি লেটারসহ বিজ্ঞান গ্রুপে উক্ত বোর্ড হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আহমদীয়া জামাত সমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

পরীক্ষার পূর্বাপর হুজুরের খেদমতে পত্র লিখক ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরেস্তি প্রণয়ন।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তা'লিমী অগ্রগতি সম্পর্কে যে পরিকল্পনা জামাতের সামনে রাখিয়াছেন উহাতে যেখানে হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন যে সে যে পরীক্ষাই দিক উহার ফল (পাশ বা ফেইল) সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ)-কে পত্র মারফত জানাইবে, সেখানে হুজুর প্রত্যেক জামাতের উপরও এই দায়িত্ব ন্যাস্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা উক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ফেরেস্তি হুজুরের খেদমতে প্রেরণ করিবেন। সুতরাং হুজুর ৭ই মার্চ ১৯৮০ ইং তারিখে জুমার খোৎবায় ইরশাদ করিয়াছেন:

"জামাতসমূহ এই ওয়াদা করুন যে, পরীক্ষাসমূহের ফল বাহির হইলে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পত্র লিখিবে তাহাদের ফেরেস্তি আমাকে পাঠাইবেন।"

উল্লেখযোগ্য যে, হুজুর প্রতিটি আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষার পূর্বাপর দোওয়ার জন্য হুজুরের খেদমতে পত্র লিখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক আহমদী ছাত্র-ছাত্রীকে এই মহা কল্যাণ ও রহমতের অধিকতর অংশীদার হওয়ার তওফিক দিন এবং জামাতের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদিগকেও হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের কর্তব্য পালনের তওফিক দিন। আমীন।

(মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।)

শুভ বিবাহ

আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় দিনাজপুর জমাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ মোঃ সানাউল্লাহ সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব এস, এম, নসরুল্লাহ-এর শুভ বিবাহ আহমদনগর নিবাসী মরহুম আবু আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মত মোবারেকা বেগমের সহিত গত ৯ই জুলাই ১৯৮০ ইং রোজ বুধবার মোট ৩৩৪২ টাকা মোহরানা ধার্য্যে আহমদনগরে উক্ত জমাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। আল-হামদু লিল্লাহ্।

উক্ত বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য সকলের নিকট বিশেষ দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

পবিত্র রমজানে পালনীয় কয়েকটি জরুরী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ

সাদাকাতুল ফিৎর বা ফিৎরানা এবং ফিদিয়া

সাদাকাতুল ফিৎর রামজানুল মুবারকের সামুষ্টিক এবাদতের একটি জরুরী অংশ এবং হক্কুল-এবাদের সহিত ইহা সম্পর্কিত হওয়ার কারণে বুনিয়াদী গুরুত্ব বহণ করে। সুতরাং বিশেষত রমজান মাসে গরীব-অভাবীদের খাদ্যদান এবং দানশীলতা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মহান ও উৎকৃষ্টতম আদর্শের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাদকাতুল ফিৎর রমজানের এবাদতের জরুরী অংশ হিসাবে ন্যূনতম কার্যকর ব্যবস্থা। আহ্কামে শরীয়ত অনুযায়ী প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়ে এমনকি নবজাত শিশুর পক্ষ হইতে উহা নির্ধারিত হারে আদায় করা ফরজ করা হইয়াছে। মোহতারম আমীর সাহেবের পূর্ব প্রকাশিত সার্কুলার অনুযায়ী এবারে ফিৎরানা মাথা পিছু ৯'৫০ পয়সা ধার্য্য করা হইয়াছে। ঈদের পূর্বেই যাহাতে অভাবী ভাই-বোনদের মধ্যে ফিৎরানার টাকা বন্টন করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাশীঘ্র উহা পরিশোধ করাই বাঞ্ছনীয়। এতদ্ব্যতীত ফিদিয়াও রমজানের উল্লেখিত এবাদতের পর্যায়ভূক্ত বিধায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রোজা রাখিতে অপারগ অথবা রোজা রাখিয়া অধিকতর সওয়াব ও বরকত হাসিলে আগ্রহী ব্যক্তিকে শরীয়তে ফিদিয়া আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ্য, এবারে ফিদিয়া ১৫০/ হইতে ২৫০ পর্যন্ত নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী আদায়ের সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হইয়াছে।

ঈদ ফাণ্ড

বর্ত্তমান যুগ যেহেতু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক জারীকৃত এশায়াতে ইসলামের মাধ্যমে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার যুগ এবং ইহাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য এবং আমাদের প্রকৃত খুশী ও আনন্দ লাভের মূল উপায়, সেজন্য ইশায়াতে-ইসলামের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক উভয় ঈদ উপলক্ষে উক্ত চাঁদা ধার্য্য করা হইয়াছে। তাঁহার সময়ে যখন টাকার মূল্য অনেক বেশী ছিল প্রত্যেক উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য উক্ত চাঁদা কমপক্ষে এক টাকা হিসাবে নির্ধারিত ছিল—সেই অনুপাতে বর্তমানে টাকার মূল্যহ্রাসের কারণে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী প্রত্যেকের এই চাঁদা বেশীর বেশী আদায় করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ আমাদের এখানে অমুস্লিমদের মোকাবেলায় এশায়াতে ইসলাম তথা অতি জরুরী প্রচার-পত্র ইত্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক টাকার প্রয়োজন সেই জন্য বন্ধুদিগকে উক্ত চাঁদা বেশী হারে আদায়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

পবিত্র রমজানে তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের চাঁদা আদায়ের গুরুত্ব

তাহরীকে জদীদ ও ওকফে জদীদের চাঁদা রমজান শরীফের মধ্যে যাহারা সম্পূর্ণ আদায় করিয়া থাকেন তাহাদের নামের তালিকা প্রতিবৎসর হযরত মুসলেহ মওউদের সময় হইতেই খলিফায়ে ওক্তের সমীপে বিশেষ দোওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইয়া থাকে। তদনুযায়ী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী এই রমজান মাসের মধ্যে উক্ত চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর দোওয়া লাভে বিশেষ যত্নবান হইবেন।

—মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ, সদর মুরুব্বী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাজেবীনাল মুফতারিয়ীন

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane- Ahmadiyya
4 Bakshibazar Road, Dacca 1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor